পরিশ্রম ও ব্যয়ভার বহন করিয়াছেন স্থানীয় মাতৃমন্দিরের কর্ত্তৃপক্ষ ; তাঁহারা দেশবাসীর ধন্যবাদের পাত্র।'

গল্পের যবনিকা উঠিল।

মামলা মিটিতে চারমাসের অধিক সময় লাগিয়াছে। এই সময়টা সত্যবালাকে মাতৃমন্দিরেই থাকিতে হইয়াছিল। পিত্রালয় কিম্বা শ্বশুরালয়—কোথাও তাহার থাকার সুবিধা হয় নাই।

সত্যবালার পিতা বাঁচিয়া নাই। মাও মরিয়াছেন এই সেদিন, সত্যবালার হরণের সংবাদ পাইবার দিন আষ্টেক পরে। বিধবা পিসিমা ভ্রাতুষ্পুত্রীর ভারগ্রহণ করিতে অপারগ বলিয়া মাতৃমন্দিরের কর্ত্তৃপক্ষকে জানাইয়া দিয়াছেন। স্বামী তাহার দেশত্যাগ করিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে, স্ত্রীকে পুনরায় গ্রহণ করা তাহার পক্ষে সম্ভব নয়। সত্যবালা নীরবে মাতৃমন্দিরের ব্যবস্থার সহিত নিজের জীবনকে মিলাইতে বাধ্য হইল।

কয়েকদিন পরে তাহার শ্বশুর জয়কৃষ্ণবাবু তীর্থস্থানের ফেরৎ আসিয়া হাজির হইলেন। বেলা তখন দুইটা। এই সময় আসাই তাঁহার পক্ষে সুবিধা। কলিকাতায় তাঁহাদের অনেক আত্মীয়স্বজন আছেন, অতএব কেহ না

দেখিতে পায়, এই সময় নিরিবিলি আসিয়া পুত্রবধূকে দেখিয়া যাওয়াই ভালো। বিকালে লোকজনের ভিড়, কি জানি তখন পথে কাহার সহিত বা দেখা হইয়া যায়!

একটিমাত্র ছেলে, তাহার স্ত্রী, সুতরাং পুত্রবধূ ছিল তাঁহার বড় প্রিয়। আসিবার সময় নাতিটিকে তিনি সঙ্গে লইয়া আসিয়াছেন। মা ত' বটে, সত্যবালা সন্তানকে দেখিয়া অনেক দুঃখ ভুলিবে।

আপিসঘরে বসিয়া ডাকিয়া পাঠাইতেই মিনিট্ দুই পরে সত্যবালা দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। মাথায় তাহার ঘোমটা অল্প, সোজা সে শ্বশুরের দিকে চাহিল। সে চাহনির মধ্যে না ছিল অর্থ, না উদ্বেগ— সে একপ্রকার নির্লিপ্ত মৃতের চাহনি। নিজের সন্তানের দিকে সম্ভবতঃ তাহার চোখ পড়িল না। জয়কৃষ্ণ মাথা হেঁট করিয়া ডাকিলেন, এসো মা, ভেতরে এসো। তোমার ছেলেকে এনেছি, কোলে নাও। ছেলে ত বটে!

ভিতরে আসিয়া সত্যবালা মাটিতে হেঁট হইয়া শ্বশুরকে প্রণাম করিল, কিন্তু ছেলেকে কোলে লইবার জন্য হাত সে বাড়াইল না, নীরবেই দাঁড়াইয়া রহিল।

ছেলেটি মাত্র কয়েক মাসের, সেও জননীকে দেখিয়া বিশেষ চাঞ্চল্য প্রকাশ করিল না।

জয়কৃষ্ণবাবু একটু অবাক হইলেন; সত্যবালার আগ্রহ নাই দেখিয়া ছেলেটাকে মাটিতে নামাইয়া দিতে তাঁহারও হাত উঠিল না। কেবল গলা ঝাড়া দিয়া কহিলেন, যে কথাটা তোমাকে বলতে এসেছি মা, সেটা তুমি নিজেই বুঝতে পারো···তোমার ছেলে তোমারই রইল, তুমি এর মা—যতই যাই হোক একথা ত আর আমরা ভুলতে পারব না—

সত্যবালা কিছু বুঝিবার চেষ্টা করিল না, কিন্তু চুপ করিয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া ছিল। সে-চাহনি না দেখিয়াও বুঝিতে পারা যায়,—জয়কৃষ্ণ মাথা তুলিতে পারিলেন না; কোনো পুরুষই সম্ভবতঃ পারে না। তবু কথাগুলি তাঁহাকে বলিতেই হইবে, আর কখনো দেখা হইবে কিনা বলা কঠিন।

—দুটি মেয়ের বিয়ে দিতে এখনও আমার বাকি, যদি জানাজানি হয় চারিদিকে···তোমাকে অবশ্য বলাই বাহুল্য,—জয়কৃষ্ণ বলিতে লাগিলেন, সমাজে বাস করি, তুমি যেন পরিচয়টা আর কোথাও দিয়ো না মা, এই অনুরোধ! তোমার মতন পুত্রবধূ পেয়েও আমি

হারালুম।—বলিতে বলিতে উড়ানি দিয়া তিনি চোখের জল মুছিলেন।

এক সময় পুনরায় কহিলেন, তুমি এর মা, তোমার হাতে না দিয়ে এ-ছেলেকে কেমন ক'রে ফিরিয়ে নিয়ে যাই? একবারটি কি একে কোলে নেবে না, বৌমা?

শ্বশুরের সহিত সত্যবালা কথা কহিত, আজও কহিল। মৃদুকণ্ঠে কেবল কহিল, না।

—অভিমান হয়েছে, জানি মা, আইনে তোমাকে অধিকার দেয়নি। হতভাগা আইন! আর কি অজয়ের বিয়ে দেবো? না, দেবো না। যদি দিতেই হয়, জানবে তোমারই ছেলেকে মানুষ করবার জন্য তাকে ঘরে আনব। আর কিছু বলবার নেই ত' বৌমা?

সত্যবালা ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, তাহার কিছু বলিবার নাই।

এখানে বোধহয় তোমার থাকার কোনো কষ্ট হবেনা?

না।

—বাড়ীটাও ভালো। বেশ গাছপালা আছে। আর এই ত সামনেই বড় রাস্তা, বারান্দায় চুপ ক'রে ব'সে থাকলে অমন একবেলাই কেটে যায়। আমাদের বাড়ীর

খবরও সব ভালো। ভালো আর কি, জ্বর-জারিটা ঐ লেগেই রয়েছে। আমি আবার শীগগিরই যাব তালুকে। আঃ কাঁদিস কেন, দাদাভাই? মা'কে দেখেনি কিনা চারপাঁচ মাস, বোধহয় চিনতে পেরেছে। আমি আজ তবে উঠি, বৌমা?

ঘাড় নাড়িয়া সত্যবালা সম্মতি জানাইতেই জয়কৃষ্ণবাবু উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন, হ্যাঁ, ভালো কথা, এই দুগাছা সোনার চুড়ি তুমি হাতে দিয়ে রেখো বৌমা।—পকেট থেকে চুড়ি দুগাছা বাহির করিয়া তিনি পুনরায় কহিলেন, এ তোমার ছেলেরই কল্যেণ—অদিনে অক্ষণে যদি দরকার লাগে—

হাত পাতিয়া সত্যবালা চুড়ি দুগাছা গ্রহণ করিল। বোধহয় সে খুশি হইয়াছে এই মনে করিয়া শ্বশুর কহিলেন, আর একটা অনুরোধ ক'রে যাবো বৌমা, সেটা সামান্যই। আমি তোমার শ্বশুর, গুরুজন, বলতে আমি সবই পারি। মেয়েমানুষের পক্ষে শ্বশুরবাড়ীর সম্মানই বড় সম্মান। তুমি নিজের নামটি বদ্‌লে আর একটি নাম নিয়ো, লক্ষ্মী মা আমার! পরিচয়টা যেন প্রকাশ না পায়—

সত্যবালা মাটিতে পুনরায় হেঁট হইয়া তাঁহাকে প্রণাম জানাইয়া কহিল, আচ্ছা।

উদ্গত অশ্রু গোপন করিয়া জয়কৃষ্ণবাবু তাঁহাকে প্রাণ ভরিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। তারপর দরজার কাছ পর্য্যন্ত গিয়া আর একবার ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, তাহ'লে আমার সব কথাগুলো থাকবে ত? তোমার ওপর ভরসা রাখতে পারি, বৌমা?

ঘাড় নাড়িয়া সত্যবালা কেবল আর একবার সম্মতি জানাইল। জয়কৃষ্ণবাবু ছেলেটিকে আদর করিতে করিতে বাহির হইয়া গেলেন। একটা দুরূহ কর্ত্তব্য যেন অনায়াসেই শেষ করিতে পারিয়াছেন। উল্লাসটা নাতির আদরের ভিতর মিশিয়া গেল।

পথের দূর পর্য্যন্ত সত্যবালা একাগ্র দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। তারপর নিজের হাতে আপিসঘরের দরজাটা বন্ধ করিয়া সে অন্দরের দিকে চলিয়া গেল। ফটকে দারোয়ান দাঁড়াইয়া আছে, মেয়েদের গতিবিধির দিকে সে লক্ষ্য রাখে।

উপরে আসিয়া সে যখন স্থির হইয়া দাঁড়াইল, দেখিল তাহারই হাতের কঠিন চাপে ইতিমধ্যে চুড়ি দুগাছা কখন্ দুমড়াইয়া বাঁকিয়া গিয়াছে। কখন্ তাহা সে বুঝিতেই পারে নাই। আবার সে টিপিয়া টিপিয়া সোজা করিতে লাগিল। কিন্তু সোজা আর হইল না,

অতএব তোবড়ানো চুড়িই সে হাতে পরিয়া লইল। তাহার নিত্য ব্যবহারের অলঙ্কারগুলি কে যে কবে তাহার গা হইতে ছিনাইয়া লইয়াছে তাহা সে অনেক চেষ্টা করিয়াও মনে করিতে পারিল না। অলঙ্কার একেবারেই ছিল কি না তাহাও সে একরূপ ভুলিয়া গিয়াছে।

ভুলিয়া যাওয়াই স্বাভাবিক। এই পাঁচ মাসে তাহার এমনিই বদল হইয়াছে যে ভাবিলেও আশ্চর্য্য হইতে হয়। এই জীবনে দাঁড়াইয়া গত জন্মের কথা তাহার একটু একটু মনে পড়ে। কোথায় গেল তাহার ঘর, কোথায় বা সংসার। যে শিশুসন্তান একটু আগে তাহাকে দেখা দিয়া চলিয়া গেল, তাহার সহিত যেন পরিচয়ই নাই, যেন অতীতকালের বিস্মৃতপ্রায় স্বপ্ন! গৃহস্থের বধূ সে? সে মা? সে স্ত্রী? কই, কিছুই তাহার মনে পড়ে না।

একটি মেয়ে তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। কহিল, সতুদিদি, পাণ খাবে?

সত্যবালা মুখ ফিরাইল। কহিল, পাণ? সেজে এনেছ আমার জন্য? দাও, খাই।

পাণ লইয়া সে মুখে পুরিল। তারপর কহিল, আচ্ছা মলিনা, তোমার কাছে একখানা আয়না ছিল যে ভাই?

মেয়েটি কহিল, আছে সতুদি, কিন্তু তার পারা উঠে গেছে। ভালো দেখা যায় না। আন্‌ব ?

এখন থাক্, পরে চেয়ে নেবো। তোমার বুঝি আজ পড়ায় মন বসল না ?

দেখতে এলুম তোমাকে। শ্বশুর কি ব'লে গেলেন তাই বলো।

সত্যবালা হাসিয়া কহিল, অনেক দামি কথা। পরের জন্মে আমি আবার যেন তাঁর পুত্রবধূ হই, এই সব।

এ জন্মের ব্যবস্থাটা ?

তার জন্যে ভগবান আছেন।

মেয়েটি বয়সে সত্যবালার কিছু ছোট। তেরো বছর বয়সে সে বিধবা হয়। বছর দুই বাদে গ্রামেরই একটি ছেলের সহিত ভাব করিয়া সে চলিয়া আসে। কিছুদিন কলিকাতার এখানে ওখানে রাখিয়া ছোক্‌রাটি তাহাকে মাতৃমন্দিরে দিয়া চলিয়া গিয়াছে, আর আসিয়া দেখা করে নাই। করিবার প্রয়োজনও ছিল না। এইখানেই থাকিয়া মলিনা লেখাপড়া করিতেছে। মা-বাপ আর ইহাকে গ্রহণ করে নাই।

ছেলেকে কেমন দেখলে সতুদি ? খুব রোগা।

হয়ে গেছে ত? তা ত হবেই। মাকে পায় না কতদিন!

সত্যবালা কথা কহিল না, কেবল বাঁ-হাতের চুড়িটায় চাপ দিতে লাগিল। মলিনা পুনরায় কহিল, ছোট ছেলে আমার খুব ভালো লাগে।

আরও কি যেন কথা মলিনা বলিয়া গেল, সত্যবালার কিছুই কানে উঠিল না। তাহার গায়ে ঠেলা দিয়া জোর করিয়া কথা না কহিলে সে আর শুনিতে পায় না। আজ হইতে একটা দিকে সে নিশ্চিন্ত হইতে পারিল, তাহাকে আর কিছুই ভাবিতে হইবে না। স্ত্রীলোকের নিজের সম্বন্ধে যে দায়িত্ব তাহা আর তাহার নাই। সন্তানটি তাহার নিজের সম্পত্তি নয়, স্বামী এখন হইতে অপরিচিত ব্যক্তি। অন্যান্য আত্মীয়স্বজন?—তাহারা ত আল্‌মারির সাজানো পুতুল! কেমন একটা অদ্ভুত মুক্তির ভিতরে সে যেন হঠাৎ ছিট্‌কাইয়া আসিয়া পড়িয়াছে। নিজের হিতাহিত, সম্পদ-বিপদ, আনন্দ-বেদনা—ইহাদের সম্বন্ধে তাহার অতঃপর আর কোনও উদ্বেগ থাকিবে না। মহাশূন্যে সে কক্ষচ্যুত উপগ্রহ, মহাসমুদ্রে নিরুদ্দিষ্ট হালভাঙা পালছেঁড়া নৌকা।

ভূমিকম্প কাহাকে বলে? এও যেন তাই। উনিশ বৎসরের জীবন, সংসারের শতলক্ষ ভালো-মন্দের সহিত যাহা ওতঃপ্রোত ভাবে জড়ানো, কেবলমাত্র একটি কম্পনের আলোড়নে তাহা তাসের ঘরের মতো চুরমার হইয়া ভাঙিয়া পড়িল। অল্প আগে যাহা ছিল, পলকের পরে দেখা গেল তাহা শ্মশান, ভস্মস্তূপ! দুঃখ করিবার মতো উৎসাহ তাহার কোথায়? বিপদ আসে অকস্মাৎ, দুর্ভাগ্য আসে একটা বিশেষ আয়োজন করিয়া, কিন্তু এ ঘটনাটা তাহার পক্ষে বিপদও নয়, দুর্ভাগ্যও নয়, এ যেন ভোজবাজি, চোখে ধূলি দেওয়া, ভানুমতীর খেলা! রোগশয্যায় ভুগিয়া ভুগিয়া যে মরে তাহার জন্য অশ্রুত্যাগ করিবার একটা আয়োজন থাকে কিন্তু সুস্থ মানুষের সহিত কথা বলিবার সময় যদি দেখা যায় তাহার প্রাণ নাই, সে মৃত, তবে কি মনে হয়?

সত্যবালা হঠাৎ হাসিয়া ফেলিল।

শ্বশুর মহাশয় তাহাকে নির্ব্বাসন দিয়া গেলেন, স্বামী আর তাহার খোঁজ লইবেন না, সন্তান বড় হইয়া জননীর কথা মনে করিবে না, ইহার জন্য অকারণ অভিমান তাহার নাই। গৃহস্থের বধূ হইয়া এই সেদিন

পর্য্যন্তও তাহার ধারণা ছিল, দেহের শুচিতা স্ত্রীলোকের পক্ষে সকলের বড় কথা। এই শুচিতাকে অকলঙ্ক রাখাই মেয়েদের জীবনের নীতি। দেহের এই শুচিতা হইতেই তাদের সামাজিক অধিকার, সম্মান, প্রতিপত্তি, গৃহশ্রী ও কল্যাণ, ইহা বিনষ্ট হইলে তাহারা জঞ্জাল।

সত্যবালার দেহের শুচিতার পরিপূর্ণ ধ্বংস হইয়াছে। তাহার চোখে জল আসিয়া পড়িল। মুখের ভিতর হইতে একটা কেমন শব্দ বাহির হইয়া বাহিরের হাওয়ায় মিলাইয়া গেল।

ওদিকের বড় দালানে বসিয়া অন্যান্য মেয়েরা কলরব করিতেছিল। তাহাদেরই আশেপাশে কয়েকটি ছোট ছেলেমেয়ে ধূলাবালি হইয়া খেলা করিতেছে। এই ছেলেমেয়েগুলির সম্বন্ধে কোনও তথ্য জানিবার এখানে রীতি নাই, কর্ত্তৃপক্ষের নিষেধ। কাহারও কাহারও আত্মীয়স্বজন ক্বচিৎ আসে, কিছু কিছু খরচ দিয়া যায়, চাঁদার খাতায় সই করে, মেয়েদের সহিত দেখা করিয়া চলিয়া যায়। এই পাঁচ মাসের ভিতর এখানকার দুই চারিটা মেয়ের বিবাহও সত্যবালা দেখিয়াছে। সেই বিবাহগুলির কি হাস্যকর অনুষ্ঠান! ভাড়াকরা পুরোহিত, ভাড়াকরা নিমন্ত্রিত! বাজার

হইতে মিস্টান্ন আনিয়া হাতে হাতে দেওয়া বহুব্যবহৃত পুরাতন একটা টোপর এবং তাহার চেয়েও পুরাতন একটা সীঁথিমৌর !

সত্যবালা হাসিয়া ফেলিল।

একটা লোক এই সময় নিচের উঠান দিয়া পার হইয়া যাইতেছিল। এখানকারই আপিসের একজন কেরানি। নাম নগেন ঘোষ। সত্যবালাকে হাসিতে দেখিয়া সে একবার সকলের অলক্ষ্যে মুখ তুলিয়া চাহিল। মামলা মোকদ্দমা সম্পর্কে ইহার সহিত কয়েকদিন কথাবার্ত্তা বলিতে হইয়াছিল, লোকটা সেই আলাপটাকে জাগাইয়া রাখিয়াছে। দুইটা হাত কপালে ঠেকাইয়া কহিল, নমস্কার।

মুখের হাসি সত্যবালার মিলাইয়া গেল। প্রতি নমস্কার জানাইবার জন্য হাত তাহার উঠিতে চাহিল না। চোখেরও পলক পড়িল না।

—শরীর ভালো আছে ত ?

শরীরের খোঁজ সে একবার লইবেই। সত্যবালার শরীর ভালো থাকা না থাকার উপর তাহার সমস্ত উৎসাহ যেন নির্ভর করিতেছে। ঘাড় নাড়িয়া শারীরিক কুশল জানাইতেই নগেন হাসিয়া চলিয়া গেল। লোকটা

একদিন আদালতের ভিতরে দাঁড়াইয়াই তাহার রূপের কিছু প্রশংসা করিয়া ফেলিয়াছিল। সে যেন দেবী—এন্‌জেল্ !

একদিন জনান্তিকে বলিয়াছিল, তোমার কাছে কিছু আব্দার জানাব। এখানকার চাকরি আমি আগেই ছেড়ে দিতুম কিন্তু তুমি আসবার পর থেকে—

সেই সময়টা আদালতে আসামীদের বিচার চলিতেছিল। একবার মুহূর্তের জন্য সত্যবালার মনে হইয়াছিল, কাঠগড়ার আসামীর সহিত নগেনের মুখের কোনো পার্থক্য নাই। চোখ ও মুখের ভাষা একই, মনোভাবের একই অভিব্যক্তি। কিন্তু সে ভদ্রসন্তান, ভীরুতা তাহার সহজাত। সে যাহাই হউক, আহার যাহারা দিয়াছে, কিছু লেখাপড়াও যাহারা শিখাইতেছে তাহাদের এই ভদ্রবেশী উৎপাতটুকু সহ্য না করিয়া উপায় নাই। লোকটা কি চায় সত্যবালা তাহা জানে, পুরুষের দাবির চেহারাটা স্ত্রীলোকের নিকট অস্পষ্ট থাকার কথা নয়।

মল্লিকপুরের কথাটা তাহার মনে পড়ে। যাহারা তাহাকে হরণ করিয়াছিল তাহাদের ভূমিকাটাও অনেকটা এইরূপ। একদিন দেবর ও ননদের সহিত [illegible] করিয়া

সে বীরভদ্রের মেলা দেখিতে গিয়াছিল, ফিরিবার সময় ভিড়ের ভিতরে জনতিনেক লোক তাহাকে বলিল, তাহাদের সহিত যাইতে হইবে। কারণ, সে সুন্দরী। দেবর ও ননদকে লইয়া সেদিনের বিপদ হইতে সে মুক্তি পাইল বটে কিন্তু লোকগুলি মল্লিকপুর পর্য্যন্ত পিছনে পিছনে আসিয়া সব চিনিয়া গেল। তাহার পর একই প্রস্তাব নানাসূত্রে আসিয়া ভদ্রগৃহস্থবধূর নিকট পৌঁছিতে লাগিল। থানায় খবর যাইতে লাগিল, পুলিশ তাহাদের গ্রেপ্তারের চেষ্টায় রহিল। সত্যবালা ভয়ে ভয়ে সূর্য্যের আলো পর্য্যন্ত দেখিত না। শ্বশুর বাড়ীর লোকেরা এই অস্বাভাবিক দুর্ব্বিপাকের প্রতিবিধান করিতে কিছুতেই সমর্থ হইল না। অবশেষে দস্যুরা তাহাকে অপহরণ করিয়া লইয়া গেল। রূপ লইয়া জন্মগ্রহণ করা অপরাধ, এবং তাহার চেয়েও অপরাধ, কুলনারীর সম্মান রক্ষা করিতে যাহারা পারে না, সেই দুর্ব্বলের আশ্রয়ে জন্মগ্রহণ করা।

নিচে ঘণ্টার শব্দ হইতেই সত্যবালার চমক ভাঙ্গিল। চাহিয়া দেখিল, দিন শেষ হইয়াছে; সন্ধ্যা ঘনাইতেছে। এই ঘণ্টার শব্দ মেয়েদিগকে সান্ধ্য প্রার্থনার জন্য প্রস্তুত হইবার ইঙ্গিত করে। এই সন্ধ্যাটা তাহাকে ভয়ানক

যন্ত্রণা দেয়। সে-যন্ত্রণাটা কোথায় তাহার কোনো হদিস নাই, তবু তাহাকে অস্থির করে উৎপীড়নে। বুকের ভিতরে তাহার জমাট বাঁধে অন্ধকার, গুরুভার দৈত্যের মতো। সত্যবালা পা টানিয়া টানিয়া হল্‌ঘরের ভিতরে গিয়া মাদুরের উপর একপাশে বসিয়া পড়িল। মন্দিরের যিনি মেয়ে-কর্ত্রী তিনি মন্ত্র পড়িতেছেন, মেয়েরা সুর করিয়া মুখস্থ বলিয়া যাইতেছিল। ঘরের একদিকে ধূপ ও দীপ জ্বলিতেছে।

আধঘণ্টা পরে সত্যবালা ছুটি পাইল। এমন প্রার্থনার রীতি তাহার শ্বশুরবাড়ীতে নাই, বাপের বাড়ীতেও ছিল না, আর কোথাও যে আছে তাহাও তাহার জানা নাই। এমনি ঘটা করিয়া চিত্তশুদ্ধি করিবার কি অর্থ ইহাও তাহার অজ্ঞাত। বিষবৃক্ষকে শোধন করিলে তাহার ফল কি মিস্ট হয়?

প্রার্থনার পরে প্রণাম সারিয়া সকলে বাহির হইয়া আসিল। যে-কয়খানি ঘর আছে সেগুলিতে আলো জ্বালাইবার নিয়ম নাই, সাধারণ যাতায়াতের পথে যে-আলো জ্বলে, সবাই তাহাতেই কাজ সারিয়া লয়। সত্যবালা কয়েকখানি বই লইয়া দরজার গোড়ায় আসিয়া বসিল। দালানে আলো জ্বলিতেছে।

বই খুলিল কিন্তু কী পড়িবে? অসংখ্য অক্ষরের জটলা, কতকগুলি শ্রুতিসুখকর কথা, হিতোপদেশ, ধর্ম্মতত্ত্ব। কিন্তু কী মূল্য ইহাদের? কী শ্রদ্ধা পাইবার যোগ্য? তাহাকে ভালো করিয়া তুলিবার এ আয়োজন কেন? সে ত জীবনে পাপ করে নাই! মানুষ তাহার জীবনের নৈতিক মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া দিয়াছে কিন্তু সে পাপ করিল কবে? কবে তাহার চিত্তের শুচিতা নষ্ট হইয়া গেল?

মলিনা আর বনলতা তাহার পাশে আসিয়া বসিয়া পড়িল। দুইজনের মুখেই হাসি, কি যেন একটা চাপা আলোচনা তাহাদের ভিতরে চলিতেছিল।

সত্যবালা হাসিয়া কহিল, শিশিরবাবুর কথা বলবে ত তোমরা? তোমাদের উনি জয় করেছেন দেখছি। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ!

না গো সতুদি; তিনি নন, এ আবার সেই পুরনো উৎপাত। বেনামী চিঠি। তোমার নামে একবার এসেছিল, মনে আছে ত? এবার আমাদের তিনজনকে একসঙ্গে—বলিয়া বনলতা একরকম হাতের ভঙ্গী করিল।

হাসিমুখে সত্যবালা কহিল, তিনজনকে? ছেলে-গুলোর আর কাজ নেই দেখছি।

মলিনা প্রথমে হাসিয়া গড়াইয়া পড়িল। তারপর বলিল, ডাকের মারফৎ আসেনি, তাহলে যে চিঠি ধরা পড়বে। রাস্তা থেকে কে ছুড়ে দিয়ে গেছে দোতলার ঘরে। বলি, কি রে ওটা? ওমা, দড়িবাঁধা একটা কাগজের তাড়া। একেবারে তরুণ সাহিত্য!

সেই চিঠি পাইয়া ইহারা যে কেহ অপমানবোধ করিয়াছে তাহা কাহারো মুখ দেখিয়া সত্যবালার মনে হইল না। তাহাদের খুশির চেহারাই প্রকাশ পাইতেছিল।

বনলতা বলিল, কি অসভ্য এখানকার ছেলেরা!

দিদিমণি চিঠি দেখেছেন?

সকলে মুখ চাওয়াচায়ি করিল। মলিনা বলিল, ভয় করে।

কেন?

আমাদেরই সন্দেহ করবেন। উনি ত আর ছেলেদের দোষ দেখতে পান্ না। সবগুলো ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে।

চোখ পাকাইয়া মলিনা কহিল, কের? সতুদির কাছে মিছে কথা?

ধরা পড়িয়া বনলতা আর একবার হাসিল।

সত্যবালা কহিল, প্রাণ ধ'রে ছেঁড়া যায় না, কেমন ?

কাপড়ের ভিতর হইতে সেলাইয়ের সরঞ্জাম বাহির করিয়া মলিনা স্থির হইয়া বসিল। বলিল, কি পড়ছ সতুদি ?

সত্যবালা কহিল, মহাজনের বাণী! পড়বি তুই ? অনেক শেখবার আছে! ভালো ভালো সংযমের কথা পাবি।

মলিনা কহিল, আমি কখনো মহাপুরুষ দেখিনি, সতুদি।

তোর কপাল! নারীজন্ম সার্থক হোলো না। মহাপুরুষদের দেশে জন্মে ওকথা বললে লোকে বলবে পাগল।

বলুকগে। বড় বড় কথাই শুনলুম চিরকাল, কাজের বেলা দেখলুম সব ফক্কিকার। প্রাণ গেল আমাদের মার খেয়ে খেয়ে, ঠকালে সবাই। ধার্ম্মিক আছে পথে ঘাটে ছড়িয়ে, ধর্ম্ম নেই দেশে। মারো ঝ্যাঁটা মানুষের মুখে!

সত্যবালা কেবলমাত্র ম্লান হাসিল।

পনেরো হইতে ত্রিশের মধ্যে বয়স—এমন মেয়ের সংখ্যাই বেশি। মধ্যবিত্ত ভদ্রঘরের মেয়ে প্রায় সকলেই। কেহ পরিত্যক্ত, কেহ প্রতারিত, কেহ বা

আশ্রয়হীন। আজ সকালে আসিয়া যে মেয়েটি আশ্রয় লইয়াছে তাহারই সম্বন্ধে নানা আলোচনা চলিতেছিল। সবাই কাজ লইয়া ব্যস্ত, এখানে ঝি রাখিবার নিয়ম নাই। নিচের ঘরে রান্না চড়িয়াছে, সত্যবালার উপর কুটনো কুটিবার ভার। আজ তাহার এই কাজের পালা!

নূতন মেয়েটি কথা বলে কম। মাথা গুঁজিয়া চুপ করিয়া সে কেবল বসিয়া থাকে। অনেক অনুরোধ উপরোধ—কিন্তু সে স্নান করিবে না, কাপড়ও ছাড়িবে না। বেশি বলিলে কাঁদিতে থাকে। আবার সবাই চলিয়া গেলে কঠিন হইয়া বসে। অনেক কষ্টে বাহির করা গেল, তাহার নাম শেফালি এবং এখনো তাহার বিবাহ হয় নাই। এই দুইটাই তাহার মিথ্যা কথা—একথা সকলেই ধরিয়া লইল।

সত্যবালা কহিল, মিথ্যে হবে কেন? ও যখন বলছে—

কর্ত্রী চুপি চুপি বলিলেন, আহা, তোমার এক কথা মা। নাম না ভাঁড়িয়ে কি এখানে কেউ আসে? সবাই জানে গো সবাই জানে। এই ধরো না, তুমি। তোমারো নাম সত্যবালা নয়, আর আমারো নাম নয় রাসমণি।

কী নাম আপনার তবে?

বল্‌ব কেন গা? তুমি চাপতে পারো আর আমি লুকোতে পারিনে? এই ত সেদিন, কানের পাশে দাঁড়িয়ে ডাকছি লাবণ্যকে, শুনতেই পায় না, যেন কে কা'কে ডাকছে! ওগো, অমন হয়। রাসমণি নামটা মনের সঙ্গে অভ্যেস ক'রে নিতে আমারো লেগেছিল তিনমাস।

সত্যবালা কহিল, আপনি কি জন্যে এখানে এসেছিলেন দিদিমণি?

চোখ কপালে তুলিয়া রাসমণি কহিলেন, শোনো কথা মেয়ের, কি জন্যে আসতে হয়েছিল তা দেবতাদেরও জানতে দিইনি, আর মরণকালে বল্‌ব তোমাকে? তোমাদের মতন সতীসাবিত্রী কি আর ভূ-ভারতে নেই বলতে চাও?

সত্যবালা অনেকক্ষণ চিন্তা করিল, তারপর বলিল, শেফালি যে বললে, বিয়ে হয়নি, সেটাও কি মিথ্যে?

রাসমণি এবার রাগ করিয়া কহিলেন, তুমি বুঝি ছিলে ওর শুভদৃষ্টির সময়? বলি, এত জেরা কেন? কুমারী মেয়েরা অত আল্‌গা নয়, বুঝলে, তারা আশায় আশায় থাকে ঘরের ভেতর! বিয়ে-হওয়া আর বিধবারা,

এরাই সহজে পথে পা বাড়ায়। বলে, বিয়ে হয়নি শেফালির! বাগানের ফুল আর বাসি ফুল, এ আমি দেখলেই চিনতে পারি। সিঁদূরটুকু মুছে আসতে কত-টুকু সময় লাগে, গা। এই যে তুমি এসেছিলে পরিচয় ভাঁড়িয়ে, পরামর্শ ক'রে পাঁচটা লোক নিয়ে শ্বশুরবাড়ী থেকে পালিয়ে এলে, চোর-দায়ে ধরিয়ে দিলে সঙ্গীদের! হবে না বাছা, তোমাদের যে ফূর্ত্তির প্রাণ! ঘরের আগল সইবে কেন? ভালো জ্বালা!

তাঁহার মাংসল মুখের নিষ্ঠুর বক্রহাসি দেখিয়া সত্যবালা স্তম্ভিত হইয়া গেল। স্থূল দেহ দোলাইয়া একবার কটাক্ষে সকলকে লক্ষ্য করিয়া রাসমণি চলিয়া গেলেন। সত্যবালার ইচ্ছা হইল, ছুটিয়া গিয়া তাঁহার হাতখানায় ঝাঁকানি দিয়া বলে, অপমান করিবার অধিকার তোমার নাই, তুমি আমার শ্বশুরবাড়ীর দাসী-গিরিরও যোগ্য নও।—কিন্তু তাহার পা উঠিল না, নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল! মুহূর্ত্তের জন্য একবার চোখ দুইটা জ্বালা করিয়া আসিল।

প্রতিবাদ করিবার উপায় নাই। অপমান বোধ করিবারও অধিকার নাই। এখানে অন্ন আছে, আশ্রয় আছে। আশ্চর্য্য, ওই স্ত্রীলোকটির কথায় আজ যেন

ইহাদের সবাইকে সে নূতন করিয়া দেখিতে পাইল। ইহাদের পরিচয়, নাম, জাতি, ইহাদের বর্ণিত কাহিনী সমস্তই কল্পনাপ্রসূত, সকলই মিথ্যা! যাহারা ভালো কথা বলে, নীতি ও আদর্শের কথা বলে, বুঝিতে হইবে, ঘোর আত্মপ্রতারণায় শ্রোতাকে তাহারা বিভ্রান্ত করিতেছে। আজ হইতে প্রত্যেককে অবিশ্বাস এবং সন্দেহের চক্ষে দেখিতে হইবে ইহা ভাবিয়া সত্যবালা মনে মনে দিশাহারা হইয়া গেল।

যে-মেয়েটি রাঁধিতেছিল তাহার দিকে সত্যবালার চোখ পড়িল। নাম তাহার সরোজিনী। অন্ততঃ এই নামেই সে চলে। মুখ বুজিয়া সে নিজের কাজ করিয়া যাইতেছে। এই মেয়েটি আসিয়াছে কিছুদিন আগে। কথা বলে সকলের সহিত, তখন বেশ থাকে, কিন্তু একলা থাকিলেই সে কাঁদিতে বসে। এই কাঁদিবার কারণ কেহ কিছু জানে না, সেও বলে নাই। কুলত্যাগ করিয়াছে কিন্তু সম্ভবতঃ মায়াত্যাগ করিতে পারে নাই। বোধ হয় অমনিই কিছু একটা হইবে। বয়সে অনেক বড়, হয় ত ত্রিশের বেশিই হইবে। চেহারায় বিগত দিনের বিলীয়মান চাকচিক্য এখনও দেখা যায়। কে নাকি একদিন বলিয়াছিল, একজন নামজাদা দেশ-

সেবকের অন্যায়ের জন্যই সরোজিনীকে এখানে আসিতে হইয়াছে।

তাহার চোখে জল দেখিয়া সত্যবালা উত্যক্ত হইয়া উঠিয়া পড়িল। কোনও দিন ইহাদের প্রতি তাহার সহানুভূতি ছিল না, আজও নাই। কুমারী জীবন ও বিবাহিত জীবন ছাড়া মেয়েদের যে আর কোনও জীবন আছে ইহা তাহার জানা ছিল না। যদি থাকে তাহার প্রতি বিশ্বাসও নাই শ্রদ্ধাও নাই। দেহের সহিত মনের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক, এই দেহের শুচিতাকে যাহারা স্বাধীন ভালোবাসার নাম করিয়া খেয়ালের খেলার মতো নষ্ট করে তাহাদের কথা ভাবিতেও সত্যবালার ভয় করে। ভাবিতে গেলে দুর্জ্জয় দৈত্যের মতো পৃথিবীর সমস্ত পাপ কেন্দ্রীভূত হইয়া তাহার বুকের উপর চাপিয়া বসে।

উপরে উঠিতে গিয়া সিঁড়ির পাশের ঘরে সত্যবালা দেখিল, নবাগতা মেয়েটি, শেফালি যাহার নাম, সে ঠিক তেমনি করিয়া বসিয়া আছে। প্রায় তাহারই সমবয়সী, মাথার খোলা চুলের রাশি কতক মুখের দিকে, কতক পিঠে পড়িয়াছে। রংটা উজ্জ্বল শ্যাম, সাধারণ বাঙালী মেয়ের মতো, মুখে কমনীয় শ্রী। সত্যবালা একাকী

কাছে আসিয়া দাঁড়াইতেই সে মুখ তুলিল। চাহনিটি সরল ও সুন্দর।

সত্যবালা কহিল, মুখ শুকিয়ে গেছে, স্নান করবে না?

শেফালি কহিল, করব। না, করব না আমি যাবো এখুনি!

যাবে? তবে এলে কেন? যেতে ত সহজে দেবে না এরা?

সে হাসিল। কহিল, দেবে না? পালাব পাঁচিল ডিঙিয়ে। যাবো বললে রাখে কে?

সত্যবালা কহিল, তোমার বাড়ী কোথায়?

অনে—ক দূর।

কে কে আছেন সেখানে? স্বামী কোথায়?

শেফালি উত্তর দিল না কিন্তু সত্যবালার মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া একসময় আবার হাসিল। কহিল, তুমি হাত দেখতে জানো? দেখো ত আমার কাজ সিদ্ধ হবে কি না?—বলিয়া সে বাঁ হাতটা বাড়াইয়া দিল।

সত্যবালা তাহার হাত ধরিয়া সস্নেহে কহিল, হাত দেখতে ত আমি জানিনে।

জানো না? আচ্ছা বলো দেখি, এখানে কেউ মুক্তো

বিক্রী করতে এসেছিল? জড়োয়া গয়না? হীরের টায়রা?

কই, না?

না কি গো, এসেছিল। দেখতে পাওনি তোমরা, তোমরা অন্ধ। মাথায় তার মণিমাণিক্যচূড়ো, ময়ূরের পালক তা'তে আঁটা, গলায় মালা মল্লিকার, পরণে পীতবাস—

সত্যবালা হাসিয়া কহিল, তারপর?

এসেছিল মুক্তো বিক্রী করতে, জানো? পদ্মপলাশ চক্ষু, হাতে বাঁশের বাঁশী, আশাবরী সুর মাখানো, বলতে পারো গেল কোন্‌দিকে?

সত্যবালা উত্তর দিতেছিল, বাহির হইতে রাসমণির স্বভাবকর্কশ কণ্ঠ শোনা গেল।—ওগো, একবার এসো তোমরা। ননীবালা, প্রীতি, গোলাপসুন্দরী—বলি, কই গো সত্যবালারা?

সত্যবালা বাহির হইয়া আসিল। সম্মুখে নগেন ঘোষ, এবং সেদিনকার সেই বণিক দলীপলাল। আরো কয়েকজন মেয়ে দেখিতে দেখিতে আসিয়া কাঠগড়ার আসামীর মতো দাঁড়াইল। রাসমণি কহিলেন, ডাকতেই সব এসে দাঁড়িয়েছে। তা হবে বৈ কি, ইচ্ছে আছে

খুব। দেখুন বাবা, এরা সব বড় বড় ঘরের মেয়ে, কেবল অবস্থায় বিপাকে প'ড়ে—এই ছ'জনের কথাই বলেছিলুম নগেন বাবুকে—

নগেনবাবু সত্যবালার দিকে চাহিয়া ছিল। দলীপলালকে পুনরায় দেখিয়া সত্যবালার বুকের ভিতরটা তোলপাড় করিতে লাগিল। এই পাগ্‌ড়িপরা লোকটা নাকি মাঝে মাঝে আসিয়া কোনো কোনো মেয়েকে এখান হইতে লইয়া যায়। কর্ত্তৃপক্ষের সহিত ইহার কি বন্দোবস্ত তাহা জানা যায় না। মেয়েরা বিশেষ আপত্তিও করে না, মুখ বুজিয়া চলিয়া যায়। এমন অনেকেই গিয়াছে। তাহাকেও যাইতে হইবে, আপত্তি তুলিয়া গোলমাল করিবার উপায় নাই, কেহ শুনিবে না! ভয়ে তাহার চোখ কাঁপিতে লাগিল।

নগেন কহিল, হয়েছে, এবার সব যাও। আবার আমি ডাকতে পাঠাব, তখন সব এসো একে একে। বলিয়া সে একবার করুণ চক্ষে সত্যবালার দিকে তাকাইয়া লইল। এবং এই মনে করিয়া সে একটু আশ্বস্ত হইল যে, তাহার চাহনির কারুণ্যটুকু সত্যবালার দৃষ্টি এড়ায় নাই।

যাইবার সময় দলীপলাল সকলকে নমস্কার

জানাইলেন। লোকটি ভদ্র এবং বিনয়ী; ভিতরে যাহাই থাকুক, বাহিরে মনে হয় পরোপকার করিতেই তাঁহার জন্ম। মহৎ ব্যক্তি। নগেনবাবুর সহিত তিনি আবার বাহিরে চলিয়া গেলেন।

মেয়েরাও চলিয়া গেল। রাসমণি দালান পার হইয়া উপরে উঠিতেছিলেন, সত্যবালা তাঁহার পিছনে পিছনে কি যেন বলিবার জন্য আসিতেছিল। হঠাৎ ঘরের দিকে চাহিয়া রাসমণি কহিলেন, শেফালি চ'লে গেল বুঝি? ও কি আর থাকবার জন্যে এসেছিল গা?

রুদ্ধশ্বাসে সত্যবালা কহিল, কোথা গেল?

মন যেদিকে টান্ল। জানো না, ওর যে মাথার দোষ হয়েছে! বাবুরা রাখতে রাজি নয়। মরবে পথে-পথে দুঃখু পেয়ে। বলিয়া তিনি উপরে উঠিয়া গেলেন।

রেলিঙ ধরিয়া সত্যবালা পাথরের মতো স্থির হইয়া রহিল।

মাতৃমন্দিরের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। মেয়েদের প্রতি সদ্ব্যবহার এবং সুব্যবস্থা আর কোনো সাধারণ প্রতিষ্ঠানে এমনটি আছে কিনা

সন্দেহ। প্রধান সম্পাদক শিশিরবাবু কাহারও প্রতি পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ করেন না। শ্রীযুক্তা রাসমণি দেবীও কখনও স্পষ্ট অসদাচরণ দেখাইয়াছেন বলিয়া শুনা যায় নাই। মোটের উপর সমস্তটা চলনসই। হতভাগিনী মেয়েদের পক্ষে কলিকাতায় বোধ হয় এইটিই একমাত্র নিরাপদ স্থান।

হতভাগিনী বলাও চলে না। সম্ভাবনাই যদি জীবনের সকলের চেয়ে বড় কথা হয় তবে তাহা আছে সকলেরই। নূতন করিয়া জীবন সুরু করিবার বাসনা কাহার না থাকে? অতীত দুর্ভাগ্যের [illegible]ত লইয়া বসিয়া থাকা অপমৃত্যু। যাহারা বঞ্চিত ও প্রতারিত তাহাদেরও আছে পথ। সেই পথে মন্দিরের কর্তৃপক্ষ মেয়েদের পরিচালিত করেন। দেশ-দেশান্তরে তাহাদের পাঠানো হয়। সেখানে গিয়া নূতন সংসার রচনা করিয়া তাহারা সুন্দর জীবন যাপন করে। রূপ ও বয়স যাহাদের আছে তাহাদের দর ও আদর দুইই অধিক। অনেক মেয়ে খুসি হইয়াই চলিয়া যায়।

এই আগমন ও নির্গমনের হেতুও আছে। অন্ন এবং আশ্রয় দিয়া হতভাগিনীর সংখ্যা বাড়াইয়া চলা কোনো প্রতিষ্ঠানের পক্ষেই সম্ভব নয়। অত টাকাও

নাই, অতখানি স্থানও নাই। এবং উদ্দেশ্যহীন পরোপকারের কোনো অর্থও হয় না। ইহার চেয়ে মেয়েদের বিবাহ দিয়া সংসার রচনা করাইতে পারিলে জাতিরও মঙ্গল, বৃহৎ হিন্দুসমাজেরও প্রভূত কল্যাণ। আজ সমস্তদিন ধরিয়া অনেকেই বিদেশ যাত্রা করিবার আয়োজনে ব্যস্ত ছিল।

রাত্রি গভীর। অন্ধকার ঘরের একান্তে শুইয়া সত্যবালা তাহার বড় বড় দুইটি চোখ মেলিয়া জাগিয়া ছিল। অপলক নিমেষনিহত চক্ষু—যে-চক্ষু আবাল্য অপরিমেয় প্রশংসায় চিরগৌরবান্বিত—সেই চক্ষু ভ্রমরের পাখার মতো মেলিয়া দিয়া সে স্থির হইয়া পড়িয়া ছিল। তাহার ভবিষ্যৎ? এই দৈত্যের মতো দেয়াল-ঘেরা অন্ধকার কক্ষের বাহিরে ভবিষ্যতে দিকে কতদূর তাহার দৃষ্টি যাইতে পারে? আকর্ণবিস্তৃত তাহার আয়ত দুই চক্ষুতারকার ভিতরের অবরুদ্ধ প্রাণ মর্ম্মান্ত যাতনায় ভাসিয়া উঠিয়াছে, বাকি সমস্ত দেহটা প্রাণপ্রবাহহীন, অসাড়, অচেতন। একটি হাত নাড়িবারও শক্তি তাহার নাই। সমস্ত শরীরের মধ্যে চোখ দুইটি কেবল বাঁচিয়া আছে।

তাহাকে যাইতে হইবে। কোথায়, তাহা সে জানে

না, তাহাকে জানানোও নিষ্প্রয়োজন। যাইতে তাহাকে হইবেই, এখানে স্থায়ী হইয়া থাকিবার আর কোনো কারণ নাই। যাহার আত্মীয়স্বজন, হিতৈষী, বন্ধু, সকলে ত্যাগ করিয়াছে তাহার পক্ষে নূতন জীবন যাপন করিতে যাওয়াই বুদ্ধির কাজ, তাহাতে সুখ আছে, আনন্দ আছে। যেন সুখ ও আনন্দের পথটা শানবাঁধানো, ইচ্ছা করিলে যেন সবাই সেই পথে হাঁটিতে পারে।

তবু তাকে যাইতে হইবে। এখানে জায়গা অল্প, অন্নও পরিমিত। যে-হতভাগিনীরা এখনও এখানে আসিয়া উঠে নাই তাহাদের জন্য স্থান ছাড়িয়া দিতে হইবে। তাহার রূপ আছে, অনেকেই তাহার জন্য আশা করিয়া আছে; কিন্তু সে যদি না যায় তবে সে অপরের সুবিধা শোষণ করিতেছে, কর্ত্তৃপক্ষের এই ধারণা দাঁড়াইবে। এই গণতন্ত্রের যুগে সে অধিকার তাহার নাই। যাইতে তাহাকে হইবেই।

কিন্তু কেন? কেন সে যাইবে?

বাহিরে নিঃশব্দ রাত্রি সাঁ সাঁ করিতেছে। সত্যবালার জ্বালাময় দুই চক্ষু প্রশ্নবাণে জর্জ্জরিত হইয়া উঠিল। তাহার প্রিয়তম স্বামী, সুখময় সংসার, বত্রিশ-

নাড়ি-ছেদনকরা শিশুসন্তান—ইহাদের কোনো মূল্য রহিল না, ইহাদেরই ছাড়িয়া ছুটিতে হইবে সুন্দর জীবন রচনার পিছনে পিছনে? যে মাতৃ-মৃত্তিকার স্নেহ আকর্ষণ করিয়া তাহার শরীরের লক্ষ লক্ষ স্নায়ু চিরজীবন প্রাণ-সঞ্জীবিত, সেই জন্মভূমি ছাড়িয়া কোন্ দূরান্তরে তাহাকে যাইতে হইবে?

ভয়ব্যাকুল হইয়া সত্যবালা উঠিয়া বসিল। এতক্ষণ জানা যায় নাই, এইবার দেখা গেল অদূরে যে-মেয়েটি শুইয়া ছিল সে একপ্রকার মুখের শব্দ করিতেছে। সেও ঘুমায় নাই! তাহাকে উঠিয়া বসিতে দেখিয়া সে কহিল, উঠলে যে সত্যবালা?

দুইজনেই বিনিদ্র, ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়া গেছে অথচ কেহ কাহারও সাড়া পায় নাই, দুইজনেই আপন আপন দুঃখের চিন্তায় ম্রিয়মান,—হঠাৎ নিজেদের অবস্থাটা চিন্তা করিয়া সত্যবালার হাসি পাইয়া গেল। রসের খোঁচায় সকলকে হাসাইতে পারে বলিয়া শ্বশুর-বাড়ীতে তাহার বিশেষ আদর ছিল, আজও সেই বিদ্রূপের সুর তাহার হাসিমুখ দিয়া বাহির হইল, কহিল, বিরহশয্যায় শুয়ে আছি, বুঝতেই পারো, কাঁটা ফুটছে পিঠে। বিদেশে রয়েছি কিনা, বর আর বরপুত্রের জন্যে মনটা বড়ই—

বরের জন্যে, না পুত্রের জন্যে, ভাই ?

ও দু'ই এক, সরোজিনীদি। যাক্ আমার না হয় এই অবস্থা, তুমি এতক্ষণ কাঁদছিলে কেন বলো ত ?

সরোজিনী তৎক্ষণাৎ চোখ মুছিয়া কহিল, কই, না ? কাঁদব কেন ভাই ? যদি বিপদে প'ড়ে থাকি সে কি আর কাঁদলেই ঘুচবে ?

তাহাকে খোঁচাইতে সাহস হইল না, পাছে এই গভীর রাত্রে সে তাহার আত্মকাহিনী ফাঁদিয়া বসে। দুঃখের ইতিহাস অবশ্যই কিছু আছে, তাহাকে আর ঘাঁটাইয়া লাভ নাই। অসংখ্য স্ত্রীলোকের দুর্ভাগ্যের গল্প শুনিয়া সে ক্লান্ত !

সরোজিনী কিয়ৎক্ষণ উসখুস করিতে করিতে এক সময় কহিল, মেয়েমানুষ দু' নৌকোয় পা দিলে তার অনন্ত দুর্গতি ভাই।

ঈষৎ উষ্ণকণ্ঠে সত্যবালা কহিল, একথা জেনেও কি লোকে পা দেয় ?

দেয় বৈকি দিদি। তবে শোন্ বলি ভাই তোকে।— বলিয়া সরোজিনী উঠিয়া বসিল ! বলিবার জন্য সে পথ খুঁজিতেছিল।

গল্পটা সংক্ষিপ্ত ! স্বামী আর স্ত্রী, দুইটি সন্তান,

সুখের ঘর। একদা অকস্মাৎ একখানা চিঠি স্বামীর হাতে ধরা পড়িল। সেই হইতেই ছাড়াছাড়ি। বহু-কাল পরে স্বামী যখন ক্ষমা করিলেন, এবং ফিরাইয়া লইবার চেষ্টা করিলেন, দ্বিতীয় পুরুষটি তখন আর ছাড়ে না। দুইজনেই সমান গুণের অধিকারী। একজনকে ছাড়িলে আর একজনের প্রতি ঘোরতর অবিচার করা হয়।

শুনিতে শুনিতে ইহারই মধ্যে সত্যবালার কেমন যেন দম আটকাইয়া আসিয়াছে। সে উঠিয়া বাহিরে আসিল। এ একটা নূতন জগৎ, ইহার সহিত তাহার কোনদিন পরিচয় ছিল না। যেমন বিস্ময়কর, তেমনি বিচিত্র। ইহারা দুষ্ট ব্রণ, অস্বাস্থ্যের চিহ্ন। তাহার নিজের বাঁধা আদর্শ, চিরাচরিত নীতি। যাহার সহিত বিবাহ হইয়াছে সে ছাড়া যে আর কেহ স্ত্রীলোকের কল্পনায় থাকিতে পারে ইহা তাহার নিকট ভয়ানক একটা দুঃস্বপ্ন। সরোজিনীর জীবনের কথা চিন্তা করিয়া সে মনে মনে শিহরিয়া উঠিতে লাগিল।

কিন্তু সে নিজে? তাহাকে লইয়া দূর দেশে যাইবার এই যে আয়োজন, ইহার ভিতরেও ত সেই উদ্দেশ্য! যাহার হাতে ভবিষ্যতে তাহাকে সঁপিয়া

দেওয়া হইবে, তাহার সহিত কী সম্পর্ক দাঁড়াইবে? স্বামী আর স্ত্রী? অর্থাৎ, ভদ্রঘরের কন্যার দুইবার বিবাহ? নূতন করিয়া ঘরকন্না? নদীর প্রবাহকে অন্য পথ ধরিতে বলা?

স্বামী আর সন্তানের কথা মনে করিয়া সত্যবালা কাঁদিয়া ফেলিল।

পরদিন সকালের দিকে একে একে মেয়েদের ডাক পড়িতে লাগিল। নগেনবাবু আপিস ঘরে বসিয়া সকলের ব্যবস্থা করিতেছিলেন। সম্মুখে বড় একখানা খাতা খোলা। প্রত্যেকটি মেয়ের প্রকৃত নাম, ধাম, পরিচয়, জন্মতারিখ, মাতৃমন্দিরে আসিবার কারণ, কে আসিয়া রাখিয়া গিয়াছে,—ইত্যাদি সমস্তই সেই খাতায় একটির পর একটি লেখা ছিল। যাহারা বিদেশে যাইবে তাহাদের জন্য দলিলপত্র তৈরী হইয়াছে। একখানা ছাপা কাগজের দলিল। তাহাতে লেখা—'মাতৃমন্দিরের হিত ব্যবস্থায় আমি সবিশেষ আনন্দিত। বয়সে আমি সাবালক। আমি স্বেচ্ছায় দূরদেশে গিয়া (পুনরায়) বিবাহ করিয়া সংসার পাতিবার মনস্থ করিয়াছি। কাহারও অনুরোধে, শাসনে, অথবা উৎপীড়নে পড়িয়া আমি এই পথ অবলম্বন করি নাই। মাতৃমন্দিরের

কর্তৃপক্ষ আমাকে এই বিষয়ে সাহায্য করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাদের নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম। ইতি।'— এই দলিলে সকলকেই নামসই করিতে হইবে। ইহার নাম নাকি 'শ্বেতপত্র।' ইহাকে মানিয়া না লইলে লাঞ্ছনার আর অন্ত থাকিবে না। সত্যবালা ভয়ে কাঁপিতে লাগিল।

অনেকেই নামসই করিয়া হাসিমুখে ফিরিয়া আসিল। সে হাসি কেবলমাত্র সুখস্বপ্নের নয়, তাহার ভিতরে দুর্ভাগ্য হইতে মুক্তি পাওয়ার গভীরতর আনন্দও ছিল। আগামী কাল যাইবার দিন। রাসমণি দেবী গলা বাড়াইয়া একসময় কহিলেন, সত্যবালা কোথায় গো, যাও মা তোমার কাজ সেরে এসো। নগেনবাবুর চ'লে যাবার সময় হোলো।

সত্যবালা রান্নাঘরের ভিতর হইতে হাসিয়া কহিল, মায়া পড়েছে আপনাদের ওপর, ছেড়ে যাব কেমন ক'রে দিদিমণি ?

ও আমার কপাল! যাবার সময় একবার ক'রে সবাই ওকথা বলে, মা। নতুন হাঁড়িতে চা'ল দিলে একদিন তুমিও যাবে ভুলে, বাছা। রাসমণি বাম্‌নি অনেক দেখে বুড়ো হোলো। এসো মা, এসো।—

বলিয়া রাসমণি তাঁহার শুষ্ক চক্ষুর স্নেহটুকু আঁচল দিয়া মুছিয়া ফেলিলেন।

সত্যবালা কহিল, রাঁধছি দিদিমণি, হাতে তেল-হলুদ—

ভালই ত মা, ওই তেল-হলুদ কপালে ছোঁয়াবার ব্যবস্থাই ত হচ্ছে—

সত্যবালা হাসিয়া উঠিল। কহিল, আমাদের ব্যবস্থা ত হোলো, সেখানে গিয়ে আমরা আপনাকেও ডেকে পাঠাব, আপনিও গিয়ে নতুন সংসার পাতবেন, দিদিমণি।

আহা, তাই বলো মা, তোমার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক, এমন দিন কি হবে? পরের ঘাড়েই পেট চালাব, চাকরি আর করতে পারিনে বুড়ো বয়সে। গাছ না হ'লে কি লতা বাঁচে?

কি ভাবিয়া সত্যবালা ভিতর হইতে পুনরায় কহিল, নগেনবাবুকে খেয়ে দেয়ে দুপুরবেলা আসতে বলুন, দিদিমণি, তখন সই ক'রে দেবো।

বেশ, তাই ব'লে দিই।—বলিয়া রাসমণি তখনকার মতো চলিয়া গেলেন।

সত্যবালা প্রস্তুত হইয়াই অপেক্ষা করিতেছিল। আহারাদির পর সবাই বিশ্রাম করিতেছে। কাহারও

হাতে সেলাইয়ের সরঞ্জাম, কাহারও হাতে ছেঁড়া ময়লা তাস, কেউ বা বটতলার মহাভারতের পুরাতন সংস্করণ লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছিল। নগেনবাবুকে আপিসঘরে ঢুকিতে দেখিয়া সত্যবালা ডাকিবার অপেক্ষা না করিয়া নিজেই সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসিল। রাসমণি এদিকে তখন ছিলেন না, দিবানিদ্রা দিবার উদ্দেশ্য তিনি নিজের ঘরে অদৃশ্য হইয়াছিলেন। দিনে তাঁহার ঘুমাইবার নিয়ম এখানে নাই কিন্তু তিনি নগেন ও দারোয়ানকে হাত করিয়া সে সুবিধা আহরণ করিয়াছিলেন।

মাথায় ঘোমটা দিয়া তাহাকে আপিসঘরে ঢুকিতে দেখিয়া নগেন হাসিয়া কহিল, এই যে, নিজেই এসেছ, ডাকতে হয়নি।

'তুমি'টা সে নিজেই করিয়া লইয়াছে, কারণ একজন আশ্রিত এবং আর একজন আশ্রয়দাতার তরফের লোক। কিন্তু নগেনের ধারণা, সেক্রেটারী শিশিরবাবুর চেয়েও সে রূপবান এবং তাহার মতো রূপবান এ তল্লাটে আর কেহ নাই। তাহার চক্ষুর ভিতর দিয়া দুইটি কথা বাহির হইয়া পড়ে। প্রথম, হাসিলে তাহাকে ভাল দেখায়; দ্বিতীয়, যে কোনো মেয়ে তাহার নিকট বশীভূত হইতে বাধ্য।

একখানা চেয়ার সত্যবালার দিকে ঠেলিয়া দিয়া সে কহিল, বসো, এই নাও হোয়াইট্ পেপার, এইখানে সই দিতে হবে।

সত্যবালা অনেকক্ষণ কাগজখানার উপর চোখ বুলাইয়া কহিল, সই ত আমি দেবো না।

নগেন হাসিল। কহিল, প্রথমটা আপত্তি ত হবেই, আমাদের মনের সামাজিক সংস্কারটা বাধা দেয় কিনা,—কিন্তু রাজি যখন হতেই হবে সত্যবালা, তখন আর—

ইহার মুখে নিজের নামটা শুনিয়া নামটার উপরেই তাহার বিতৃষ্ণা আসিয়া গেল। হঠাৎ মৃদুকঠিন কণ্ঠে সত্যবালা কহিল, মেয়ে মানুষের দুবার বিয়ে হয় কোথাও শুনেছেন আপনারা?

শুনেছি বৈ কি। হামেসাই হচ্ছে।—তারপর সোজা তাহার মুখের দিকে চাহিয়া নগেন কহিল, তোমার শরীর কি ভালো নেই?

উত্তর দিবার প্রবৃত্তি হইল না। ক্ষণকাল পরে সত্যবালা কহিল, আপনি আমাকে বাঁচান, জীবন থাকতে আমি আর বিয়ে করতে পারব না। আমার সব গেছে, কিছু আর বাকি নেই, ধর্ম্মটা যেন থাকে।

নগেন আবার হাসিল। বলিল, এতে তুমি রাজি নও, বুঝলুম। কিন্তু তোমার চল্‌বে কেমন ক'রে ভবিষ্যতে? উপায় ত একটা চাই।

ভিক্ষে ক'রে খাবো, ঝিগিরি করব।

তার কত বিপদ জানো, তোমার এই বয়েস—

সত্যবালা অপমানে মাথা হেঁট করিল। এমন একদিন ছিল, স্বামী পর্য্যন্ত তাহাকে এইরূপ ইঙ্গিত করিতে দ্বিধা বোধ করিতেন। ইহা লইয়া বাদানুবাদ করিতে তাহার মন ঘৃণায় রি রি করিয়া উঠিল।

তোমাকে ছেড়ে দিতে গেলে আমার চাক্‌রি যাবে—নগেন কহিল, ধরো এই বেকার সমস্যার দিনে,—মাত্র চল্লিশ টাকা মাইনে পাই, তারপর বিয়ে করেছি, মেয়ে হয়েছে একটি,—তুমিই বলো ত, চাক্‌রি গেলে কি আমার চল্‌বে?

অবান্তর কথা, অনাবশ্যক আলোচনা। বিরক্তিতে সত্যবালা অস্থির হইয়া উঠিল, কিন্তু মুখে কিছু না বলিয়া তাড়াতাড়ি নিজের হাত হইতে সেই চুড়ি দুগাছা খুলিয়া দিয়া কহিল, আপনার স্ত্রীকে দেবেন, তাঁকে আমার প্রণাম জানাবেন। আপনার কাছে ভিক্ষে চাইছি, আমাকে মুক্তি দিন্ এখান থেকে।

আপনি ভদ্রসন্তান, আপনার চাকুরি গেলে চাকুরি পাবেন কিন্তু আমার স্ত্রীধর্ম্ম যদি যায়—

তা ত বটেই। আচ্ছা, তুমি যখন দিলেই চুড়ি দুগাছা, তখন—বলিয়া নগেন সেগুলি তাহার কোটের ভিতরের পকেটে সযত্নে রাখিয়া পুনরায় কহিল, তাহলে আমার চাকুরি যাওয়াই তুমি চাও, কত দুঃখের চাকুরিটা,—তোমাকে মুক্তি দিতেই হবে, কেমন সত্যবালা?

অশ্রুকম্পিতকণ্ঠে সত্যবালা কহিল, যদি আপনি দয়া করেন তবেই—

দয়া, দয়া, দয়া! সামান্য মানুষ আমি, সামান্য বক্‌শিসেই এত বড় দয়াটা করতে হবে? শিশিরবাবুর মতন লোকেরা দয়া করে, দয়ার সাগর তারা,—যশ চায়, সমাজপতি হতে চায়, পরোপকার করার প্রবল অহঙ্কার নিয়ে তাদের জন্ম, মানুষের ভালো করতে না পারলে রাতে তাদের ঘুম হয় না। কিন্তু তোমার যদি চোখ থাকত তাহলে দেখতে সত্যবালা, কে কা'র দয়া চায়।

সত্যবালা নির্ব্বাক হইয়া গেল। কিছু বুঝিতেই পারিল না।

নগেন কহিল, চুড়ি দুগাছা দিয়ে তুমি মনে করলে বুঝি অনেক দিলে। এটা তোমার দান নয়, উপহার। আমি কি এমনই ভুলব? হা ভগবান! পুঁটি মাছের প্রাণ আমার, বাঁচাটাও অল্প, দাবিটাও সামান্য। ছোট হয়ে জন্মেছি, বুকের ছাতিটা সঙ্কীর্ণ, তাই ব'লে শিশিরবাবুদের মতন মহত্ত্বের মুখোস প'রে বেড়াইনে। এক হাতে দিই আর এক হাতে পাবো ব'লে। তোমাকে বাঁচাতে গেলে চাকরিটা যাবে সেইটেই আমার কাছে বড় কথা। মনের রঙটা অবস্থায় প'ড়ে ধুয়ে মুছে গেছে, স্বার্থবুদ্ধিটা এখন সচেতন।

সত্যবালা কহিল, আপনি কি বলছেন বলুন?

তাহার মুখের দিকে চাহিবার সাহস নগেনের ছিল না, মাথা হেঁট করিয়া সে সত্যবালার সুন্দর দুখানি পায়ের উপর মাঝে মাঝে দৃষ্টি বুলাইয়া লইতেছিল। কিন্তু এবার সে মুখ তুলিয়া হাসিয়া কহিল, আধুনিক কালের হাওয়ায় আমি মানুষ, যোগ্যতার চেয়ে কৃতিত্বই বেশি মানি। আবেদন নিবেদনের যুগ ত নয়, বীরভোগ্যা বসুন্ধরা! তোমার অভিজ্ঞতাও কি এই কথা বলে না? ডাকাতের দল তোমাকে লুঠ ক'রে নিয়ে এল, বাধা দিতে পেরেছিল কেউ?

সত্যবালা সোজা তাহার দিকে চাহিয়া দেখিল। লম্বাচওড়া পেশীবহুল তাহার দেহ, যদি অতর্কিতে কোনোদিন বলপ্রয়োগ করে তবে আর সে বাঁচিবে না। ভয়ে তাহার চোখ কাঁপিতে লাগিল। প্রার্থনীয় বস্তু একই, কেহ তাহাকে পাইতে শারীরিক শক্তি প্রয়োগ করে, কেহ বা ছলনার দ্বারা আকর্ষণ করিতে চায়। এই লোকটা যে মিষ্ট ভাষায় তাহার নিকট প্রার্থনা জানাইতেছে ইহার জন্য সে কৃতজ্ঞ। জানে সে লোকটার চরিত্রের প্রকৃত চেহারা। তাহার অনুরোধটা যে রাখিতে রুচি নাই, এ-কথা তাহাকে বুঝানো যাইবে না। প্রবৃত্তি যাহার মলিন—রুচির কথা সে মানিবে কেন? কিন্তু পরক্ষণেই তাহার মন অন্য কথা কহিয়া উঠিল। এই ত নূতন সংসার পাতিয়া জীবনকে লইয়া চিরদিন প্রতারণার খেলা খেলিতে হইবে, নীতি ধর্ম্ম মনুষ্যত্ব সমস্তই দিতে হইবে জলাঞ্জলি; সেই যন্ত্রণাজর্জ্জর প্রাণধারণের নিতা[illegible]নির চেয়ে বৃহৎ অবারিত মুক্তি—সেই কি কাম্য নয়? সামান্য অনুরোধ, কেনই বা আপত্তি? মেরুদণ্ড তাহার চিরদিনের জন্য ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, ক্লেদাক্ত তাহার দেহ, তবে কেন এ সঙ্কোচ, এ দ্বিধা? তাহার দেহের ধ্বংস

হোক, সে যাক্ জাহান্নমে, কেবল তাহার এই বিধ্বস্ত উৎপীড়িত প্রাণের মর্ম্মপুটে স্বামী ও সন্তানের স্মৃতিকে অক্ষয় করিয়া রাখিবার অধিকার তাহার থাকুক।

আমার অনুরোধটা তবে মাঠে মারা গেল, কেমন?

সামান্য অনুরোধ আপনার।—বলিয়া কাঁদিতে গিয়া সত্যবালার মুখে হাসি বাহির হইল। সে-হাসি যেন আগুনের হল্‌কা। তাহার ঠোঁট পুড়িয়া গেল, দাঁত জ্বলিয়া উঠিল, জিব জ্বালা করিতে লাগিল। পুনরায় কহিল, আমাকে কিন্তু বাঁচাতেই হবে। আপনি কাজের লোক, পরে আপনার চাক্‌রি একটা হয়ে যাবেই।

প্রলোভনের সন্ধান পাইয়া নগেন সানন্দে রাজি হইয়া গেল। মূল্য দিয়াই উপকার কিনিতে হইবে। কিন্তু পাছে লোকটা পরে প্রবঞ্চনা করে এজন্য সত্যবালা আর একবার সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে তাকাইল। কী কুৎসিত, কী পাশবিকতায় কলঙ্কিত সে-মুখ,—আর যাহাই হউক, ও-মুখ কখনও তাহাকে প্রতারণা করিবে না। সত্যবালা তখনকার মতো উঠিয়া পড়িল।

পিছনে পিছনে কুকুরের মতো আসিয়া একসময়

তাহার একখানা হাত ধরিয়া নগেন কহিল, রাত ন'টা নাগাৎ এসো, আমি থাকব আপিসঘরের পে[illegible]ন দিকে, কেমন ?

আচ্ছা—

হাতখানা ঘৃণায় ছাড়াইয়া লইয়া [illegible]বালা তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল। বেলা তখন পড়ি[illegible] আসিয়াছে ! রাসমণির গলার সাড়া পাওয়া যাইতেছিল [illegible]

রাত্রি নয়টা বাজিল। সঙ্গে লইবার [illegible]তা কিছুই নাই, খালি হাতেই সত্যবালা অশান্ত হৃদয় [illegible]য়া নিচে নামিয়া আসিল। নিচেটা তখন অন্ধকার। [illegible]রে বড় রাস্তায় গাড়ীর চলাচল ইহারই মধ্যে অনেক[illegible] কমিয়া আসিয়াছে। আপিসঘরের পিছন দিক দিয়া পা[illegible]ইবার সময় দেখা গেল, দলীপলাল বণিক তখনও বসি[illegible] সক্রে-টারীর সহিত আলোচনা করিতেছেন। টা[illegible] কড়ির শব্দ হইতেছিল। তাঁহাকে দেখিয়া ভয়ে ও দুর্ব্বলতায় সত্যবালার বুকের ভিতরটা ঢিপ ঢিপ করিয়া উঠিল।

অন্ধকারে ঠিক জায়গায় দাঁড়াইয়া নগেন অপেক্ষা করিতেছিল। সত্যবালাকে দেখিয়া কাছে আসিয়া চুপি চুপি কহিল, চাকরদের ঘরে কেউ নেই, এসো। ওরা টের পায়নি ত ?

না। সরোজিনীদির কাছে শুই, তিনি ঘুমোচ্ছেন। আর কেউ জেগে নেই। কোন্ দরজা দিয়ে যাবো।— তাহার কণ্ঠে অপরিসীম ব্যাকুলতা জড়ানো।

নগেন হাসিয়া কেবল কহিল, এসো।—বলিয়া তাহার হাত ধরিল!

রাত্রি নয়টা হইতে দশটা। দশটার পর সত্যবালা তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিল। বাগানের দরজার চাবি তাহার হাতে। নিকটে আলো ছিল না, তাহা হইলে দেখা যাইত, তিন চারিটা অশ্রুর ধারা তাহার মুখের উপর শুকাইয়া উঠিয়াছে। নগেন আগেই আপিসঘরের পাশ দিয়া সকলের অলক্ষ্যে বাড়ী চলিয়া গিয়াছিল। বিকালের পর তাহার আর ডিউটি থাকে না।

দ্রুতপদে ঘাসের উঠান পার হইয়া সত্যবালা আসিয়া পিছন দিকের দরজার তালা খুলিয়া ফেলিল। আর দুই পা, তাহা হইলেই তাহার অবাধ অগাধ মুক্তি। যেমন মুক্তি সমুদ্রের আগাছার, যেমন মুক্তি বায়ুতাড়িত-শুষ্ক ছিন্নপত্রের। হৃদয়ের মধ্যে তাহার অশান্ত তরঙ্গ দুলিতেছিল।

এ বৌহু, কাঁহা ভাগ্‌তে হো।—

গলার আওয়াজ পাইয়াই সত্যবালা দৌড়াইবার চেষ্টা করিল কিন্তু বৃথা, দারোয়ানটা যেন তাহারই জন্য আড়ালে অপেক্ষা করিতেছিল এমনি ভাবে আসিয়া খপ করিয়া বজ্রমুষ্টিতে তাহার একখানা হাত ধরিয়া ফেলিল। সত্যবালা তাহার হাত আঁচড়াইয়া দিল, কামড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিল কিন্তু তাহাকে হিড়হিড় করিয়া ভিতরে টানিয়া আনিয়া দারোয়ান উচ্চকণ্ঠে গোলমাল করিয়া উঠিল।

চারিদিকে আলো জ্বলিল, স্ত্রীপুরুষ সবাই ছুটিয়া আসিল। শিশিরবাবু আসিলেন, দলীপলাল আসিয়া দাঁড়াইলেন, মেয়েরা আসিয়া হাজির হইল, রাসমণি ছুটিয়া আসিতে গিয়া হুমড়ি খাইয়া পড়িলেন। একটা হৈ চৈ পড়িয়া গেল।

অভিযোগটা এই, আপিসঘর হইতে চাবি চুরি করিয়া সত্যবালা দরজা খুলিয়া পলাইতেছিল, দারোয়ান পথের দিকে পাহারায় ছিল, আসামীকে গ্রেপ্তার করিয়া আনিয়াছে। এমন ঘটনা মাতৃমন্দিরে মধ্যে মাঝে ঘটিয়া থাকে, এ নূতন নয়। পলাইবার চেষ্টা করিয়া অনেকেই পারে নাই।

রাসমণি তীব্র হুঙ্কার দিয়া কহিলেন, সুখে থাকতে

ভূতে কিলোয়, কেমন? নষ্টদুষ্টু মেয়েমানুষের ভালো কর্ত্তে নেই। যে কাজ করতে বেরিয়েছ ওতে স্বামী পুত্তুর আর ভালো লাগবে কেন? বলি অ মিথ্যেবালা, ঢাকতে কি পাল্লে আমাদের কাছে? শশুরঘর ছেড়ে রসের খোঁজে বেরিয়েছিলে, দোষ চাপালে পাঁচটা গুণ্ডোর ঘাড়ে—বুঝতে আমরা সবাই পারি। তোমাদের মতন সতীলক্ষ্মীদের জন্যেই ত' দেশে এমন নারীহরণের হিড়িক! সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে; আমি বাবা সব বুঝি! থাকো আজ রাতে তালা বন্ধ, কালকে যেতে হবে দলীপদাদার সঙ্গে।

মেয়েরা সত্যবালাকে ধরিয়া উপরে লইয়া গেল। আলোয় সবাই দেখিতে পাইল, একখানা হাতে তাহার রক্তের ধারা। এতক্ষণ বুঝিতে পারে নাই, নিজের হাতের উপরই সে প্রাণপণে দাঁত বসাইয়াছিল। কিন্তু তাহার মুখে পাগলের হাসি দেখিয়া সকলেই স্থির করিল, তাহার হিষ্টিরিয়ার ব্যারাম আছে।

পরদিন বিকালের দিকে সকলে হাওড়া ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছিলেন। পিছনের গাড়ীতে দলীপলাল, নগেন ঘোষ, শিশিরবাবু এবং প্রচারকার্য্যের দুইটি ভদ্রলোক! সম্মুখে যে গাড়ীখানা আগে আসিয়াছিল,

তাহাতে রাসমণি, ননীবালা, প্রীতি, গোলাপসুন্দরী, সত্যবালা এবং আর দুইটি মেয়ে। আজিকার শুভ-যাত্রায় সকলের মুখই খুসিতে উজ্জ্বল।

টিকিট করাই ছিল, গাড়ীরও সময় কম। কুলির মাথায় জিনিষপত্র দিয়া সকলে প্লাট্‌ফরমের ভিতরে ঢুকিয়া দলীপলালের নামে রিজার্ভ্‌ করা নির্দ্দিষ্ট কামরায় উঠিলেন।

সত্যবালার হাতে একটা ব্যাণ্ডেজ বাঁধা ছিল। সে হাসিয়া প্রীতির গায়ে ঠেলা দিয়া কহিল, কি ভুলই করেছিলুম ভাই, কাল আমাকে ভূতে পেয়েছিল—তার পর কাম্‌রাখানার ভিতরে চারিদিকে চাহিয়া কহিল, মাইরি, শেকেণ্ড কেলাস গাড়ীতে আমি জীবনে চড়িনি। আমরা ভাই চিরকাল থার্ড কেলাসের যাত্রী।

সবাই তাহার কথা শুনিয়া হাসিল। দলীপলালের সহিত রাসমণিও হাসিয়া কহিলেন, আজ তবে তোমার ভূত ছেড়েছে!

ছাড়তেই হবে দিদিমণি, ভূত বৈ ত নয়। আঃ ঘুম যা দিয়েছি কাল রাতে, হিষ্টিরিয়ার চোদ্দপুরুষ সেরে গেছে। কই, একটা পাণ দাও না ভাই, ননীবালা?

পাণ কি তুমি খাও নাকি? অভ্যেস আছে?

আর অভ্যেস! অভ্যেস করব সব এবার থেকে, সবই সইবে। প্রীতিদি, রাতে সব খাবার বন্দোবস্ত আছে ত? ট্রেণে উঠলেই আমার ভাই ক্ষিধে পায়,—ও নগেনবাবু, আমাকে দুটো কমলা-লেবু কিনে দিন্ না?

কমলালেবু? বেশ ত, এই যে দিচ্ছি কিনে। বলিয়া নগেন শশব্যস্তে একটা ফিরিওয়ালাকে ডাকাডাকি করিতে লাগিল। সত্যবালা হাসিয়া উঠিল তাহার ব্যস্ততা দেখিয়া।

প্রীতি কহিল, সবে ত সন্ধ্যে, এরই মধ্যেই শীত ধরেছে ভাই। রাত্তিরে বেশ মজা ক'রে ঘুমোতে হবে।

অনেক বিছানা আছে, পেতে দেবো প্রীতিদি? আমি কিন্তু ভাই শোব তোমার কাছে।

অদূরে দলীপলাল দাঁড়াইয়া ছিলেন, তাঁহার নিকট গিয়া মধুর হাসি হাসিয়া সত্যবালা কহিল, দলীপলালজী, আগ্রায় নেমে আমি কিন্তু তাজমহল দেখতে যাবো, নৈলে আপনাকে ছাড়ব না, হ্যাঁ। আমি থাক্‌ব আপনার সঙ্গে।

দলীপলালজী সানন্দে রাজি হইলেন। গাড়ী

ছাড়িবার আর দেরি নাই। নগেন লেবু লইয় তাড়াতাড়ি আসিয়া হাজির হইল। তাহার দিকে ন ফিরিয়া সত্যবালা কহিল, দিদিমণি, অনেক অপরাধ ক'রে গেলুম, সুসময়ে আপনার ঋণ শোধ করব, ক্ষমা করবেন।

রাসমণি কহিলেন, তুমি যে এমন লক্ষ্মীমেয়ে তা জানতুম না দিদি। বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। চোখ রগড়াইয়া অশ্রু বাহির করিলেন।

ওই যা, চুলটা ভালো ক'রে বেঁধে দাও না ভাই ননীবালা, মাথাটা আজ আঁচড়ানোই হয়নি।—বলিয়া *সত্যবালা বেশ সরস করিয়া পাণ চিবাইতে চিবাইতে* দুই হাত তুলিয়া *নিজের মাথার চুল ফিরাইতে লাগিল।* শিশিরবাবু দূর হইতে তাহাকে দেখিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া মুখ ফিরাইলেন। জীবনে অনেক মেয়েকেই অনেক রকম করিয়া বদলাইতে তিনি দেখিয়াছেন। আর কিছুতেই তাঁহার বিস্ময় নাই।

ট্রেণের বাঁশী বাজিল। সবাই গাড়ীতে উঠিয়াছে। শিশিরবাবুর সহিত নগেন ও রাসমণি ফিরিয়া যাইবেন। জানলার কাছে সত্যবালা দাঁড়াইয়া হাসিমুখে তাঁহাদের কাছে বিদায় লইতেছিল। তাহারই হাতের কাছে

প্লাট্‌ফরমের উপর দাঁড়াইয়া নগেনকে উসখুস করিতে দেখিয়া সে কহিল, কিছু কথা আছে আপনার ?

মুখ মলিন করিয়া নগেন তাহার পকেটের ভিতর হইতে একগাছা সোনার চুড়ি বাহির করিয়া কহিল, একটা চুড়ি তোমার কাছে রাখো সত্যবালা, স্বামীর স্মৃতি ! বলিয়া সকলের অলক্ষ্যে তাহার হাতে একরূপ গুঁজিয়া দিল। কোথায় যেন তাহার মনের ভিতরে কাঁটা ফুটিতেছিল। মুখ সে আর তুলিতে পারিল না॥

গাড়ী ছাড়িয়া দিয়াছে। দেখিতে দেখিতে ষ্টেশন পার হইয়া ট্রেণখানা দূর হইতে দূরে চলিতে লাগিল। হাতখানা বাহিরের দিকে ঝুলাইয়া পাথরের মূর্ত্তির মতো সত্যবালা বসিয়া রহিল। পুনরায় একসময় সচেতন হইয়া হাতখানা সে যখন সরাইয়া লইল, দেখা গেল, চুড়িগাছা তাহার হাতে নাই, পথের অন্ধকারে কোথায় ফেলিয়া দিয়াছে।

রিজার্ভ করা কাম্‌রার ভিতর ছয়টি মেয়ে ও তিনটি পুরুষ। অবশ্য পরিচিত তাহারা। কিন্তু পরিচয়ের চেয়ে অপরিচয়ই বেশী। দলীপলাল ছাড়া বাকি দুইজন প্রৌঢ় বাঙালী। পেটের দায়ে তাঁহারা দূর দেশের

সঙ্গী হইয়াছেন। মেয়েগুলির স্থায়ী ব্যবস্থা করিয়া দিয়া আবার তাঁহাদের ফিরিতে হইবে। দুইজন দুই পাশে বসিয়া দলীপলালের নানারূপ তোয়াজ করিতে-ছিলেন। দলীপলাল এক সময় উঠিয়া গাড়ীর দুইটা দরজায় চাবি বন্ধ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া আসিয়া বসিলেন।

একটি মেয়ে কহিল, সতুদি কি ভাবছ?

সত্যবালা সহসা মুখ ফিরাইয়া হাসিল। কহিল, ভাবছি ভাই অনেক কথা। বড়লোকের সঙ্গে আবার বিয়ে হবে, ভাবছি তার মন যুগিয়ে চল্‌তে পারব কিনা।

ওমা, গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল!—বলিয়া আর একজন হাসিয়া উঠিল।

ভাবতে হয় বৈ কি, ভাই। সব মেয়েই ভাবে, বরকে খুসি করব কেমন করে! খুসি ক'রে যাওয়াই ত আমাদের কাজ ভাই।

একজন তাহার চিবুক নাড়িয়া দিয়া কহিল, খুসি করতে হবে না, তোমার রূপ দেখলেই সে খুসি হবে।

আহা, তাই বলো ভাই, তাই যেন হয়। তবু সে রূপ কি আর আছে আমার!

তাহার বলিবার ভঙ্গী দেখিয়া সবাই হাসিয়া লুটাইয়া পড়িল। সত্যবালা সঙ্গে না আসিলে তাহাদের সমস্ত আনন্দই মাটি হইত।

অন্ধকার প্রান্তরের উপর দিয়া ডাকগাড়ী বন্য জন্তুর মতো তীরবেগে ছুটিয়া চলিতেছিল। শীতের সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেছে। ভিতরে প্রবল ঠাণ্ডা। দরজা জানালা সব বন্ধ। বাহিরে কখন্ কোন্ ষ্টেশন পার হইয়া যাইতেছে তাহা বুঝিবার উপায় ছিল না। বেঞ্চের উপর বিছানা পাতিয়া মেয়েরা একে একে নিজেদের শুইবার বন্দোবস্ত করিয়া লইল। সত্যবালা কহিল, আমি ভাই সকলের মাঝখানে শোবো।—বলিয়া উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই সে সিঃসঙ্কোচে ভাল বিছানাটা দখল করিয়া শুইয়া পড়িল। ওধার হইতে দলীপলাল সমস্ত লক্ষ্য করিয়া খুসি হইয়া উঠিলেন।

মেয়েদের ভিতরে গল্প সুরু হইল। সকলেই একসঙ্গে অনেকদিন কাটাইয়াছে, ট্রেণেও চলিয়াছে তাহারা একত্র, কিন্তু আর কিছুদিন পরেই তাহাদের প্রত্যেকের জীবনই বিভিন্ন পথ ধরিয়া চলিবে। সকলের হাসির পিছনেই ছিল একটি সকরুণ বিচ্ছেদ-বেদনা! আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধবদের সহিত জন্মভূমিরও মমতা কাটাইয়া

তাহাদের চলিয়া যাইতে হইতেছে। নূতন সংসার রচনা করিতে হইবে, নূতন মাটির সহিত পরিচয় করিতে হইবে। দেশের মানুষ তাহাদের প্রতারিত করিয়াছে, তাহাদের জীবনকে কলঙ্কিত করিয়াছে, বিদেশের মানুষরা তাহাদের প্রতি সদ্ব্যবহার করিবে, যোগ্য মর্য্যাদা দিবে, সম্মান দেখাইবে।

যমুনা এইবার কথা কহিল,—আমরা কোথায় নামব বলো ত ?

সত্যবালা হাসিয়া তাহাকে ভয় দেখাইয়া কহিল, জানিসনে ? সে এক নতুন মানুষের দেশে! ওরে বাবা, মুণ্ডুটা তাদের মানুষের, কিন্তু বাকি দেহটা ঘোড়ার মতন, চারটে পা, একটা ল্যাজ !

যাও, তোমার কেবল ঠাট্টা সতুদি।

প্রীতি কহিল, জিজ্ঞেস করো না ভাই ননীবালা ওঁদের, কোথায় আমরা যাচ্ছি ?

ননীবালা মুখ ফিরাইয়া কহিল, আমার ভাই লজ্জা করে, তুই জিজ্ঞেস কর্ গোলাপ।

গোলাপসুন্দরী কহিল, ওমা, ও লোকটাকে আমার ভয় করে ভাই। তুই বল্ সরযূ। ওমা, সরযূ এরই মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছে। কী ঘুম-কাতুরে মেয়ে গো!

কেহই কিছু বলিল না, মুখ চাওয়াচায়ি করিয়া আবার নীরবে বসিয়া রহিল। কিন্তু তাহাদের মনের ভিতরে স্বস্তি ছিল না। প্রীতি কহিল, কোনো বদ্ মতলব নেই ত? যদি ঠকায় আমাদের? দলীপলালকে আমার ভাই বিশ্বাস হয় না।

ননীবালা কহিল, আহা, তোমার এক কথা। কী আছে আমাদের যে ঠকাবে?

তা বটে, তাহারা চুপ করিয়া রহিল। তাহাদের কিছুই নাই। প্রীতি আবার কহিল, মেয়েমানুষ ত আমরা। যদি ধরো—

যমুনা কহিল, জানিনে ভাই কি বরাতে আছে। ভাসতে ভাসতে কোথায় গিয়ে ঠেকব কে জানে!

গোলাপ কহিল, ভয় পেয়ে আর কি হবে বলো। রামে মারলেও মারবে, রাবণে মারলেও মারবে। তবু যতদিন বাঁচব আমরা যেন সবাই একসঙ্গে থাকতে পারি। বলিতে বলিতে তাহার চক্ষু ঝাপসা হইয়া আসিল।

সত্যবালা বিদ্রূপ করিয়া উঠিল,—একসঙ্গে? শোনো আব্দার মেয়ের। তাহলে সবাই মিলে একজনকেই বিয়ে করতে হয়। আমার বাপু সতীনের জ্বালা সইবে না।

গোলাপসুন্দরীর মুখে আবার হাসি ফুটিয়া উঠিল। প্রীতির রাগ পড়িয়া গেল। কহিল, মরা মানুষ জেগে ওঠে সতুদির কথা শুনে।

সত্যবালা পুনরায় কহিল, তুমি ত ভাই গান জানো যমুনা, সেই গানটা গাও—'ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না বঁধূ—'

যমুনা কহিল, তোমার মতন আমার ফুর্ত্তি নেই সতুদি, কান্না পাচ্ছে আমার মলিনার কথা ভেবে। আসবার সময় তার চোখ ছল ছল করতে লাগল। ভারি লক্ষ্মী মেয়ে মলিনা।

সত্যবালা ঠোঁট উল্‌টাইয়া কহিল, তুমিও যেমন, মায়াদয়ার ধার ধারতে নেই। ভাবলে কেবল ভাবনাই সার। তার চেয়ে একটা গান ধরো, দলীপলাল খুসী হয়ে ভাল পাত্র জুটিয়ে দেবে।

গোলাপ চোখ টিপিয়া চুপি চুপি কহিল, আর যদি ও নিজে পছন্দ ক'রে বসে?

তাতেই বা কি, আমাদের কাছে এখন সব জাতই সমান।

প্রীতি কহিল, তোমার এত সখ সতুদি?

ওমা, তা আর নয়? এক দফা সংসার খরচ হয়ে গেছে, আর এক দফার আনন্দ কে না চায় বলো?

মেয়েমানুষের মন ভাই ছাঁচ বদলালেই আবার নতুন।

মুখে কাপড় চাপা দিয়া প্রীতি হাসিল। ননীবালা কহিল, তুমি দেখছি সবাইকে ছেড়ে আগেই বিয়ে ক'রে পালাবে সভুদি, আমরা থাকব পিছিয়ে।

সত্যবালা কহিল, নিশ্চয়, সুবিধে একবার পেলে হয়।

ডাকগাড়ী গমগম করিয়া ছুটিতেছিল। রাত্রি ঘনাইয়া উঠিতেছে। আবার কিয়ৎক্ষণ সকলে চুপচাপ। সত্যবালা ফিরিয়া দেখিল, মলিনার মলিন মুখখানার কথা ভাবিতে ভাবিতে যমুনা এইবার বেশ আরাম করিয়া শুইয়া পড়িল। ট্রেণের ঘন ঘন দোলায় সকলেরই চোখে তন্দ্রা জড়াইয়া আসিতেছে। ওধারে সেই ভদ্রলোক দুটি মাথা হেলাইয়া চোখ বুজিয়া আছেন, তাঁহাদের মাঝখানে এদিকে পিছন ফিরিয়া শুইয়া দলীপলাল জাগিয়া আছেন কিনা তাহা সঠিক বুঝা যাইতেছিল না।

প্রীতির ভয় তবু যায় না। সে একসময় হঠাৎ কহিল, শুনেছি মেয়েছেলেকে বিদেশে নিয়ে গিয়ে গুণ্ডারা খুব খারাপ জায়গায় বিক্রি ক'রে দেয়। আমাদের কপালে সে সব কিছু নেই ত ভাই ?

সত্যবালা কহিল, থাকলেই বা, সেখানে অনেক টাকা রোজগার করা যায় রে।

ওমা, সে আবার কি করে হবে ভাই?

মনীবালা কহিল, দেখিসনি, মেয়েরা সেজেগুজে দাঁড়িয়ে থাকে অনেক বাড়ীতে? অমনি ক'রে।

প্রীতির চোখে জল আসিয়া পড়িল,—যদি আমাদের তাই করতে বলে ওরা?

সত্যবালা কহিল, তাহ'লে করতেই হবে। ওরা যে অভিভাবক। মন্দ কি রে, টাকা ত আসবে অনেক।

ঠাট্টা আমার ভালো লাগে না সতুদি? ছাই টাকা, টাকার জন্যে মান খোয়াবে?

তা হ'লে প্রাণ খোয়াও!—সত্যবালা কহিল, ওরে, মান-অপমান ওসব যতক্ষণ থাকি চেনাজানা লোক-জনের মাঝখানে, নৈলে তার দাম কি! মান রাখি তাদের, নিজেদের জন্যে নয়! তোদের যারা ঠকালে তাদের মুখ আর চাইবি কেন?

প্রীতি ফোঁস করিয়া কহিল, আমরা ভদ্রলোকের মেয়ে নই?

ভুলে যা ওকথা। বলিয়া সত্যবালা চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

ননীবালা কহিল, আচ্ছা ধরো, যার সঙ্গে বিয়ে হবে সেও যদি খারাপ লোক হয়?

বেছে নিতে পারবিনে?

নিদ্রাজড়িত কণ্ঠে গোলাপসুন্দরী কহিল, ঠগ বাছতে গাঁ ওজোড়।

তবে তোদের কপালের দোষ। আমি ভাই বেছে নেবো।

ওপরটা দেখে চিন্‌বি কেমন ক'রে?

সত্যবালা কহিল, মেয়েমানুষের চোখ, ভেতরটাও দেখতে পাবো।

আর কেহ তাহার কথার প্রতিবাদ করিল না। সকলের চোখেই ঘুম আসিয়াছে। সত্যবালা একবার গিয়া বাথরুমে ঘুরিয়া আসিল। রাত সম্ভবত দশটা বাজিয়া গিয়াছে। প্রীতির মাথার দিকে জায়গা করিয়া সত্যবালা এইবার আপাদমস্তক মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িল। আজকের রাত্রে আহারাদির আর কোনো ঝঞ্ঝাট নাই। কমলালেবু দুইটা বেঞ্চের তলায় গড়াগড়ি যাইতেছিল।

সকলকে শুইয়া পড়িতে দেখিয়া ননীবালারও আর বসিয়া থাকিবার উৎসাহ রহিল না, সকলের সহিত

নিজের ভাগ্যকেও সংযুক্ত করিয়া দিয়া একসময় সেও এপাশে জায়গা করিয়া শুইয়া পড়িল।

গভীর রাত্রে সত্যবালা চোখ খুলিয়া চাহিল। অসাড় হইয়া সে কতক্ষণ পড়িয়া ছিল কে জানে, কিন্তু চোখ দেখিয়া মনে হইল না সে ঘুমাইয়াছে, তাহার সজাগ ও সচেতন চোখের ভিতরে নিদ্রার আমেজটুকু পর্য্যন্ত নাই। ঠাণ্ডায় হাত পা অসাড়, অকর্ম্মণ্য,—নিজেরই নিশ্বাস পড়িতেছে কিনা তাহাও সে বুঝিতে পারিল না। সবলে একবার নাড়া দিয়া না জাগাইলে তাহার সমস্ত দেহ এমনি করিয়াই ঘুমাইতে থাকিবে।

একটা ঝাঁকানি দিয়া সে মাথা উচুঁ করিল। দেখিল, তাহার বন্ধুরা সবাই গভীর ঘুমে নিমজ্জিত; ওদিকে দলীপলাল ও তাঁহার সঙ্গী দুইটির আর সাড়াশব্দ নাই; গাড়ীর গতিবেগ দ্রুত, উন্মত্ত। জানালা, দরজা, জিনিস-পত্র, বেঞ্চগুলি, তাহার সঙ্গিনীরা, উপরে ওই উজ্জ্বল আলো, তাহার অশান্ত হৃদয়—সমস্ত মিলিয়া যেন নিরুদ্দেশ অন্ধকারের দিকে ছুটিতেছে, যেন কোন্ বিশেষ মুহূর্ত্তে প্রবল শব্দে চুরমার হইয়া ভয়ানক থামা থামিবার জন্য পাগলের মতো ছুটিয়া চলিতেছে। সেই মুহূর্ত্ত কি সন্নিকট? কোথায় সে যাইতেছে? যে পরিণাম তাহার

আসন্ন তাহার নিকট কি এমনি করিয়াই আত্মবলি দিতে হইবে ?

গায়ে পাতলা চাদরখানা জড়াইয়া সে উঠিয়া বসিল। কান দুইটা রাঙা, মাথাটা ধরিয়াছে, কতক্ষণ হইতে তৃষ্ণায় তাহার ভিতরটা শুকাইয়া উঠিয়াছে, এইবার তাহার মনে পড়িল। জলের জন্য সে এদিক ওদিক চাহিতে লাগিল।

গোলাপ ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া কি যেন একবার বকিয়া উঠিল। এটা তাহার স্বভাব। যে কথা সে জাগ্রত অবস্থায় চাপিয়া থাকে, তাহা তাহার ঘুমের ঘোরে বলিয়া ফেলে। সত্যবালা একটু হাসিল। এপাশে ননীবালা আর যমুনা। ঘুমাইলে তাহাদের কোনোদিকে আর ভ্রুক্ষেপ থাকে না। সত্যবালা তাহাদের গাত্রাবরণগুলি গুছাইয়া ঠিক করিয়া দিল, তাহারা জানিতে পারিল না।

জলের তৃষ্ণাটা তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিল। জল আর একটু হাওয়া। বাহিরে শীতার্ত্ত মুমূর্ষু রাত্রি, জানালার কাঁচের ভিতর দিয়া মাঝে মাঝে নিকটবর্ত্তী প্রান্তরে জ্যোৎস্নার আভাস চোখে পড়িতেছিল, তবু তাহার একটু বাতাসের প্রয়োজন। সত্যবালা আস্তে আস্তে একবার উঠিয়া বাথ্‌রুমের ভিতরে গিয়া ঢুকিল।

শব্দ কিছুই হয় নাই তবুও ওদিক হইতে দলীপলাল

একবার মাথা তুলিয়া মেয়েদের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। তাহারা সকলে অকাতরে ঘুমাইতেছে। গাড়ীর গতি এই সময় দেখিতে দেখিতে মন্দীভূত হইয়া আসিল। দূরে বোধ হয় ষ্টেশন্ আছে, লাইন্ ক্লীয়ার নাই দেখিয়া লাল নিশান দিয়াছে। দলীপলাল আবার নিশ্চিন্ত হইয়া মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িলেন।

কয়েক সেকেণ্ড্ থামিয়া ট্রেন আবার চলিতে লাগিল।

শীতের বাতাস হু হু করিয়া বহিয়া যাইতেছে। চোখের উপর দিয়া গাড়ীখানা হুইস্‌ল্ দিয়া চলিয়া গেল। দুইটা লাইনের মধ্যবর্ত্তী সঙ্কীর্ণ প্রস্তরময় পথের উপরে দাঁড়াইয়া সত্যবালা একবার হাসিল। কী দুর্জ্জয় সাহসে সে যে জানালার ভিতর দিয়া দ্রুত নামিয়া পড়িয়াছে তাহাই ভাবিয়া সে অবাক হইয়া গেল। একদা সে গৃহস্থের বধূ ছিল, লাজনম্রা, ব্রীড়াবনতা। তাহার পরে দৈবদুর্ব্বিপাক,—সমস্তটা আকস্মিক, ভূমিকম্পের মতো আকস্মিক। তাহার চরিত্রের ভিতরে ঢুকিয়াছে সেই আকস্মিকতা, সেই ক্ষণ-উত্তেজনা। ঘটনার মুহুর্মুহু সংঘাত, দুঃসাহসের তরঙ্গ-চূড়ায় ভাসিয়া যাওয়া। সমস্তটা অস্বাভাবিক, কিন্তু অবশ্যম্ভাবী। সত্যবালা হাসিতে লাগিল।

চারিদিকে যতদূর দেখা যায় বিশাল প্রান্তর; পূর্ব্ব দিগন্তে কৃষ্ণপক্ষের শীর্ণ পাণ্ডুর চন্দ্র, জ্যোৎস্না তাহার মৃদু, অস্পষ্ট। সমস্ত পৃথিবীর বুকের উপরে রাত্রি তাহার কালো ডানা মেলিয়া পড়িয়া আছে। পশুপক্ষী মানুষ—কোথাও জীবনের এতটুকু চিহ্ন নাই। বুকের ভিতরটা তাহার ধক্ ধক্ করিতেছিল।

মাথার উপর দিয়া গায়ে চাদর জড়াইয়া যেদিকে গাড়ীখানা গিয়াছে সেইদিকে সত্যবালা এক এক পা করিয়া চলিতে লাগিল। পায়ের নিচে পাথরের নুড়ির পথ কন্‌কনে ঠাণ্ডা, পিছল। কিন্তু এমনি করিয়া সকাল পর্য্যন্ত তাহাকে হাঁটিতেই হইবে, ক্লান্তি আসিলে চলিবে না। রাত কত সে তাহা জানে না, বারোটা কি তিনটা বুঝিবার উপায় নাই।

দুই প্রান্তর দুইদিক হইতে আসিয়া লাইনের নীচে পাড়ের কাছে মিশিয়াছে। সেখানে নামিবার উপায় নাই। মাঝে মাঝে দুইপাশে জলার উপরে নক্ষত্রের আলো প্রতিবিম্বিত হইতেছিল। চারিদিকে দিগন্তব্যাপী নিরবচ্ছিন্ন ঝিল্লির আওয়াজ, সেও এক বিপুল নীরবতা। পা দুইটা সত্যবালার এলোমেলো চলিতেছে, তাহারা এমন একটা বেপরোয়া গতিবেগ পাইয়াছে যে, আর

তাহাদের থামাইবার উপায় নাই। সর্ব্বশরীর ঠাণ্ডায় জমিয়া যাইতেছিল।

দূরে আলো নজরে পড়িল। সে যে কতদূরে তাহা দুর্বোধ্য। আলো দেখিয়া তাহার চক্ষু ব্যাকুল হইয়া উঠিল, কিন্তু দেখিতে দেখিতে হঠাৎ আলোটা নিবিয়া গেল। মনে হইল, আলেয়া! গ্রামে থাকিতে এই আলেয়া-ভূত লইয়া একদা কত ভয়ই সে পাইয়াছে। একদিন রাত্রে আলেয়ার গল্প শুনিতে শুনিতে ভয়ে সে তাহার স্বামীর গলা জড়াইয়া ধরিয়াছিল। আলেয়া দেখিয়া তাহার দিদিশাশুড়ীর ফিট্ হওয়াটা তাহার এখন মনে আছে। কিন্তু আজ?- আজকে ভয় পাইবার বৃত্তিটাও তাহার মরিয়া গেছে।

মুখের ভিতর হইতে অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহার একটা শব্দ বাহির হইতেছিল, শব্দটা বন্ধ হয় না, থামে না। শীতের হাওয়ায় মুখখানা বাঁকিয়া গিয়া আওয়াজটা বাহির হইতেছে,—অস্ফুট, অসংযত। প্রাণের মূল হইতে উদ্গীরিত একটা যেন সকাতর আর্ত্তস্বর! তাহার শিশু-সন্তানের গলার আওয়াজটা অনেকটা এমনিই। সে এখন কাহার কাছে শুইয়া ঘুমাইতেছে কে জানে! এখনও নিশ্চয় হাসিতে শিখে নাই।

কি রকম একটা অদ্ভুত ব্যাকুলতা মুহূর্ত্তের জন্য তাহার মনকে ছুঁইয়া গেল।

বাঁদিকে দূরে আবার আলো দেখা গেল। এবার আর সে আলেয়া দেখিয়া ভুলিবে না। প্রত্যাশা করিয়া থাকার মতো মিথ্যা আর কিছু নাই। চলিতে চলিতে কিন্তু সত্যবালা অপলক্ষ চক্ষে সেইদিকে চাহিয়া রহিল। দুই ঠোঁট একত্র করিয়া মুখের শব্দ বন্ধ করিয়া সে দেখিতে লাগিল। আলোটা অদৃশ্য হইলেই সে খুসি হইত কিন্তু তাহা আর নিবিল না। মনে হইল, সেটা যেন তাহার দিকে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। এইবার তাহার চোখে ভয় ফুটিয়া উঠিল।

আরও গোটা দুই আলো চোখে :পড়িতেই সে সজাগ হইয়া তাকাইল। এতক্ষণ বুঝিতে পারে নাই, এবার দেখিল কাছেই এক জনহীন ষ্টেশন্—লোকজনের সাড়াশব্দ কোঁথাও নাই। তবু কোথায় যেন জীবনের একটি অলক্ষ্য আভাস অনুভব করিতে পারিয়া সত্যবালা আশ্বস্ত হইয়া তাড়াতাড়ি আসিয়া পৌছিল। তাহার কাছে টিকিটও নাই, কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দিবার মতো কথাও তাহার মনে আসিল না। একখানা প্রকাণ্ড করোগেটের চালার ধারে আসিয়া সে একবার থমকিয়া দাঁড়াইল।

এ আওরৎ, উধার মৎ—যানা।

হঠাৎ অদূরে একটা লোকের গলার আওয়াজ শুনিয়া সত্যবালা সভয়ে ভিতরে আলোর কাছাকাছি আসিয়া দাঁড়াইল। উত্তর সে কিছুই দিল না, শীতে কাঁপিতেছিল। চাহিয়া দেখিল, সেই চালার নিচে আপাদমস্তক ঢাকা দিয়া অসংখ্য মানুষের দেহ নিদ্রিত হইয়া রহিয়াছে। তবু তাহাদের দেখিয়াই তাহার একটু সাহস বাড়িল এবং তাহাদের একান্তে একটু জায়গা খুঁজিয়া সে এইবার বসিয়া পড়িল। পাশেই একটা প্রকাণ্ড কুকুর শুইয়া ছিল, তাহাকে দেখিয়া বিরক্ত হইয়া উঠিয়া গেল।

যে লোকটা তাহাকে দেখিয়াছিল, কি মনে করিয়া সে এবার কাছে সরিয়া আসিল। বোধ হয় ষ্টেশনের কুলি, কালো কাপড়ে মাথা পর্য্যন্ত ঢাকা, মুখ দেখা গেল না। কাছে আসিয়া মিষ্ট কণ্ঠে কহিল, কাঁহাসে আতা? কাঁহা যাওগে—এই আওরৎ?

সত্যবালা চুপ করিয়া রহিল, উত্তর দিল না।

লোকটা পুনশ্চ কহিল, আরে, তোমারা গোড়সে খুন্ গির্‌তা—সত্যবালা পায়ের দিকে চাহিয়া দেখিল, সত্যই রক্ত পড়িতেছে। কখন হোঁচট্ লাগিয়াছে তাহা সে বুঝিতে পারে নাই। কিন্তু লোকটার কণ্ঠে যে সহানুভূতির

সুর বাজিয়াছে তাহার অর্থ সে জানে। ভয়ে সে কণ্টকিত হইয়া উঠিল। লোকজন এদিকে কেহ নাই, যদি এ লোকটা প্রশ্রয় পাইতে থাকে তবে সে নিরুপায়। নিকটে যাহারা ঘুমাইতেছে, বজ্রপাত হইলেও তাহারা জাগিবে না। কাঠ হইয়া সত্যবালা বসিয়া রহিল।

কুলিটা হাসিতেছিল। এবার আঙুল দেখাইয়া কহিল, কপালমে ক্যা লাগায়া ?

কপালে সত্যবালা একখানা টিপ পরিয়াছিল, চিমটি দিয়া সে সেখানা তৎক্ষণাৎ তুলিয়া ফেলিয়া দিল। দুই চোখে তাহার ভয় ও বিরক্তি। কিন্তু কুলিটা সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া আরো কাছে সরিয়া আসিল।

এইবার সত্যবালা মরিয়ার মতো হাসিয়া উঠিল !— মুখের কাপড় সরাইয়া হাত নাড়িয়া কহিল, ওইখানে ব'সো,—তোমার নাম কি ?

মেরা নাম ? সুখন্।

দেশ কোথায় ? মুলুক ?

পট্না জিলা।

বোহু হ্যায় ? কি নাম তার ?

উস্‌কা নাম—তারা।

সত্যবালা কহিল, বহু হ্যায় ত আমার পাস্ এসেছ কেন

সুখন্ হাসিয়া কহিল, শির হমারা খারাপ হো গিয়া। তুমারা সাথ মরদ নেহি হ্যায় ?

হ্যায়, ও এখুনি আয়েগা।

সুখন্ অবিশ্বাস করিয়া হাসিল। কহিল, নেহি তুম্ ঝুট্ বোলতা।

সত্যবালা হাসিল এবং তাহার সহিত সুখনও হাসিয়া অস্থির হইল। তারপর সে জানাইল, এই নিকটেই তাহার বাসা। স্ত্রী সেখানে নেই, বাপের বাড়ীতে প্রসব হইতে গিয়াছে। সত্যবালা গিয়া তাহার ঘরে আজকার রাতটা কাটাইয়া আসিতে পারে। ইহাও সে জানাইয়া দিতে ছাড়িল না, সত্যবালার মতো এত ভালো সে আর কাহাকেও বাসে না, এবং তাহার জন্য সুখন্ এখনই প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত। এমন সরল প্রেমের চেহারা জগতে দুর্ল্লভ !

কোন্ মেয়ে ভালোবাসা পাইয়া খুসি না হয় ? সত্যবালা গৌরবে গরবিনীর মতো হাসিয়া হাসিয়া সুখনের সহিত আলাপ করিতে লাগিল। লোকটার বলিষ্ঠ চেহারা দেখিয়া ভিতরে ভিতরে তাহার ভয় করিতেছিল।

কাহারও প্রতি তাহার আর বিশ্বাস নাই। মুখে হাসি—কিন্তু ভিতরে ভিতরে তাহার কান্না পাইতে লাগিল।

কুকুরটা আসিয়া আবার তাহার কাছাকাছি বসিল। শীতের জন্য সেও এক একবার কাৎরাইয়া উঠিতেছে। মানুষের চেয়ে কুকুরের কাছে সে নিরাপদ। ইচ্ছা হইল কুকুরটার কাছে সে ঘেঁসিয়া বসে।

তুমি কি কাম্ করো সুখন্?

সুখন্ কহিল, সিগ্নালমে—

সুখন্ আরো কি বলিতে যাইতেছিল, পিছন দিক হইতে একজন পোষাকপরা প্রৌঢ় লোক দ্রুত আসিয়া পা দিয়া তাহাকে একটা ঠেলা দিয়া জাতীয় ভাষায় বলিল, হারামি কাঁহাকা, গাঁজা খেয়ে ব'সে গল্প করছিস, গাড়ী আসছে খেয়াল নেই?

লাথি খাইয়া সুখন্ উঠিয়া পড়িল এবং পালাইবার সময় করুণ চক্ষে সত্যবালার দিকে চাহিয়া এই কথাই প্রকাশ করিয়া গেল, পবিত্র প্রেমের জন্য এমনি লাঞ্ছনাই চিরদিন সহ্য করিতে হয়।

পোষাকপরা লোকটিও সুখনের পিছু পিছু গেল কিন্তু তাহাদের পথের দিকে দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া সত্যবালা দেখিতে পাইল, দূরের গাছপালার ভিতর দিয়া রাত্রির

আকাশ ভোরের আলোয় স্বচ্ছ হইয়া আসিয়াছে। বিশ্বাস তাহার হইল না, চক্ষু পরিষ্কার করিয়া সে পুনরায় চাহিয়া রহিল। আজিকার এই অফুরন্ত অন্ধকার তবে কি সত্যই শেষ হইয়াছে? আনন্দের আতিশয্যে তাহার ক্লান্ত দুই চক্ষুতে অশ্রু আসিয়া পড়িল।

দেখিতে দেখিতে চারিদিক স্পষ্ট হইয়া উঠিল। লোকজনের আনাগোনা সুরু হইল। ষ্টেশনের আলোক-গুলি ম্লান হইয়া আসিল। যাহারা মড়ার মতো মুড়ি দিয়া পড়িয়া ছিল, তাহাদের অনেকেই 'সীতারাম' করিতে আরম্ভ করিয়াছে। পাশের কুকুরটাও খাবার খুঁজিতে উঠিয়া গেল। ষ্টেশনের ওপারে গাছপালার ভিতরে পাখীদের প্রভাতী গান সুরু হইয়াছে। ঝাড়ুদাররা ঝাঁটার শব্দ করিতেছে।

ইঞ্জিনের আওয়াজ হইতেছিল। বোধ হয় এ একটা জংশন স্টেশন; অনেকগুলি লাইন দেখা যাইতেছিল। স্টেশনের কি নাম তাহা সত্যবালা জানে না। ইহাও সে জানে না, কোথায় সে যাইবে, কি তাহাকে করিতে হইবে, কোথায় আশ্রয় মিলিবে। শীতের হাওয়ায় জমাট বাঁধিয়া সে নীরবে বসিয়া রহিল। কপালটা তাহার একটু একটু জ্বালা করিতেছিল, ডান হাতের অসাড় আঙ্গুল বুলাইয়া

বুঝিতে পারিল, টিপ তুলিতে গিয়া নিজেরই নখের আঘাতে তাহার কপালটা ক্ষত হইয়াছে। ক্ষত আর ক্ষতিতে সে বিধ্বস্ত। তা হউক, দুর্ভাগ্য তাহার সহিবে কিন্তু যাহা দুর্নীতি বলিয়া সে জানে, তাহা যে মানিয়া লইতে হয় নাই ইহাই তাহার পরম লাভ। কেমন একটা অদ্ভুত সান্ত্বনা সে মনের ভিতরে খুঁজিয়া পাইতে লাগিল। তাহার দেহের আর কোনো মূল্য নাই, সমস্ত শুচিতাই ধ্বংস হইয়াছে,—দেহের সম্মান, আভিজাত্য, সৌন্দর্য্য সমস্ত গিয়াছে কিন্তু তাহার রক্তের ভিতরে বংশপরম্পরায় যে নীতি ও ধর্ম্ম প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে, আজ এই চরম দুরবস্থার ভিতরে বসিয়াও মনে হইল তাহা একটুও ক্ষুণ্ণ হয় নাই। পদে পদে মৃত্যু বরণ করিয়াও কোথায় যেন সে বাঁচিয়া যাইতেছে। কেন—ইহার উত্তর দিতে সে অক্ষম।

রাঙা রৌদ্র দেখিতে দেখিতে ফুটিয়া উঠিল। এ যেন এক নূতন দেশ—অপরিচিত, অপরিজ্ঞাত। বাংলা দেশ যে ছাড়াইয়া আসিয়াছে একথা বুঝিতে সত্যবালার দেরি হইল না। ধূলা, মাটি, বৃক্ষলতা, সমস্তই বিভিন্ন, মানুষ পর্য্যন্ত আলাদা। এমন দেশে জীবনে সে আসে নাই। গ্রামে থাকিতে একবার সপরিবারে মথুরা-বৃন্দাবন ও

কাশী-গয়া যাইবার কথা হইয়াছিল কিন্তু গ্রামের ষ্টেশন পার হইয়া যাওয়া আর তাহার কপালে ঘটিয়া উঠে নাই। সেদিন কত কল্পনাই সে করিয়াছিল।

একে একে সবাই তাহার আশপাশ হইতে জিনিসপত্র সমেত উঠিয়া চলিয়া গেল, সে পড়িল একা। তাহার যাইবার লক্ষণও নাই। ঠাণ্ডায় তাহার হাত পা অকর্ম্মণ্য, শীতের হাওয়ায় অবশ। নানা লোকে তাহার প্রতি নানা রকম দৃষ্টি ফেলিয়া চলিয়া যাইতেছে, কেহ কিছু প্রশ্ন করিলে আর তাহার উত্তর নাই। হঠাৎ অদূরে এক জায়গায় তাহার চোখ পড়িল, মনে হইল কেহ যেন কিছু ফেলিয়া গিয়াছে। চোখ ফিরাইয়া অন্য দিকে চাহিয়া পুনরায় চুপ করিয়া গেল। কিন্তু আর বসিয়া থাকা চলিতেছে না। ষ্টেশনের বাহিরে কোথাও গিয়া নিজের কিছু সুবিধা করিবার জন্য সে একসময় এদিক ওদিক তাকাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। নিজের দেহের কোনো অংশ যাহাতে স্পষ্ট করিয়া দেখা না যায় এমন ভাবে সে গায়ের চাদরখানা ভালো করিয়া জড়াইয়া লইল। শীতকালের ভোরে পায়ের ঠাণ্ডা ফুটিতে লাগিল কিন্তু সেদিকে সে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া অন্যদিকে পা বাড়াইল।

চলিয়াই যাইতেছিল, আবার ফিরিয়া আসিয়া কি মনে করিয়া সে হেঁট হইয়া দেখিল রংদার কাপড়ের ছোট থলি। হাতে তুলিয়া লইয়া কিন্তু সে অবাক হইয়া গেল—ভিতরে কাগজ আর টাকা। টাকা ?—তাহার গা ছম ছম করিয়া উঠিল। চোর বলিয়া যদি এখনই কেহ ছুটিয়া আসে তবে আর তাহার কিছু বলিবার থাকে না। চোরের প্রতি উৎপীড়ন সে গ্রামে থাকিতে একবার দেখিয়াছে। পা কাঁপিতে লাগিল। জীবনে সে না বলিয়া পরের জিনিসে হাত দেয় নাই। কে যে কখন্ ইহা ফেলিয়া গিয়াছে তাহা তাহার বোধগম্য হইল না। ভাবিল, রাখিয়া দেয়; আবার ভাবিল, কাহার জন্য ? মালিকের হাতে যদি না পড়ে তবে রাখিয়া দিয়া লাভ কি ? সে রাখিয়া দিলে আর একজন ত লইবেই ! ন্যায় ও নীতির শাসন কেবলমাত্র কি তাহারই জন্য ?

তবু তাহার হাতখানা কাঁপিতে লাগিল। তাহার চরম দুর্ভাগ্যের দিনে এমন বরাৎ খুলিয়া যাওয়ার রহস্য কী ? এ যেন তাহার ভাগ্যবিধাতার যৎকিঞ্চিৎ সহানুভূতি। তাহার নিষ্ঠুর নিয়ামকের কৃপা ও বিদ্রূপ যেন জড়ানো আছে। অনেকক্ষণ ধরিয়া সত্যবালা দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার বুকের ভিতর কাঁপিতেছে, দম বন্ধ হইয়া

আসিতেছে। তাহার দুর্ভাগ্যকে ভয়, সৌভাগ্যকে আরও বেশী ভয়। পথের মাঝখানে কিছু কুড়াইয়া পাওয়া যে কতখানি বিভীষিকাময় তাহা সে বুঝিতে পারিল। এখনই যদি কেহ আসিয়া ফিরাইয়া লয় তবে সে বাঁচে। যে কেহ আসিয়া চাহিলেই সে চোখ বুজিয়া তাহার হাতে তুলিয়া দিবে। এমন কি কেহ নাই যে তাহাকে এই বিপদ হইতে মুক্তি দিতে পারে? হঠাৎ কেন জানি মনে হইল তাহার জীবনের সমস্ত ধর্ম্ম ও সততা, তাহার সতীত্ব ও মনুষ্যত্ব পর্য্যন্ত যেন ইহার ভিতর লুকাইয়া আছে; এই সামান্য বস্তুটি যেন তাহার চরিত্রের মস্ত একটা অগ্নিপরীক্ষা! উপরে, নীচে, বামে, দক্ষিণে—চারিদিক হইতে সবাই যেন অবাক্ হইয়া তাহার দিকে তাকাইয়া রহিয়াছে। তাহার জীবন ও মৃত্যু পর্য্যন্ত স্তম্ভিত হইয়া গেছে।

হাত কাঁপিয়া থলিটা পড়িয়া যাইতেছিল কিন্তু সে ফেলিতে পারিল না। কষ্টক্লিষ্ট চোখ দুটিতে তাহার অশ্রু ভরিয়া আসিল। দুর্ভাগ্যের ভিতরে এই ভয়ানক বিদ্রুপটা তাহার বুকের ভিতরে ভয়ানক হইয়া বাজিতে লাগিল। ভূতাবিষ্টের মতো থলিটা শক্ত করিয়া ধরিয়া সে একদিকে চলিতে লাগিল। কাপড়ের ভিতরে

লুকাইয়া লইয়া চলিতে তাহার সাহস হইল না। সকলেই যাহাতে দেখিতে পায় এমনি করিয়াই সে ধরিয়া রাখিল।

কিন্তু কেহই তাহার হাতের দিকে তাকাইল না। সমস্ত ষ্টেশনের চারিদিকে সে উদ্‌ভ্রান্ত পদক্ষেপে ঘুরিয়া বেড়াইল। কত যাত্রী কত দিকে আপন আপন লক্ষ্যে চলিয়া গেল। কত ব্যস্ততা, কত কোলাহল। এদিকের প্লাটফরমে একখানা গাড়ী ছাড়িতে আর দেরী নাই, সত্যবালা ছুটিয়া আসিল সেইদিকে। অনেকগুলি জানালায় সে ঘুরিয়া বেড়াইল। অনেক মানুষের মুখের দিকে সে তাকাইল, বিশেষ মুখখানা দেখিলেই সে চিনিতে পারিবে, টাকার থলিটা তাহার কি না।

একজনকে জিজ্ঞাসা করিল, তোমার কিছু হারিয়েছে?

ক্যা? নেহি।

সত্যবালা তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল। লোকটা তাহাকে পাগল মনে করিয়া তাহার পথের দিকে চাহিয়া রহিল!

দেখিতে দেখিতে বাঁশী বাজাইয়া গাড়ীখানা ছাড়িয়া দিল, সত্যবালার হাতের থলি হাতেই রহিয়া গেল। আর তাহার পা চলিতেছে না। ক্লান্ত হইয়া ধীরে ধীরে সে ষ্টেশনের বাহিরে পথে নামিয়া আসিল।

শহরের নাম তাহার জানা নাই। কিন্তু ধূলিমলিন

পথ ও কাঠ-পাথরের বিচিত্র কোঠাগুলি দেখিয়া আন্দাজে মনে হইল, পশ্চিমের কোনো একটা পুরাতন শহরই হইবে। হিন্দুস্থানীয় দেশ, বাঙালী তাহার চোখে পড়িল না। এদিকে ওদিকে দুই একটা দোকান, কিছু কিছু অপরিচিত খাদ্যবস্তু সাজানো, কিন্তু তাহাদের ভিতরে স্নেহের ইঙ্গিত একটুও নাই, শুষ্ক ও রুক্ষ। খাবারগুলি যেন এদেশের লোকের চরিত্র-পরিচয়।

পথের বাঁকটা ঘুরিয়াই কিন্তু সত্যবালা অবাক হইয়া গেল। অকল্পিত অপ্রত্যাশিতরূপে সে দেখিতে পাইল, বিপুলবিস্তৃতা এক নদীর তীরের কাছে সে আসিয়া পড়িয়াছে। এ যে সর্ব্বপাপনাশিনী মা-গঙ্গা, ইহা আর তাহাকে বলিয়া দিতে হইল না, জল দেখিয়াই সে চিনিতে পারিল। হঠাৎ যেন তাহার পরিশ্রান্ত জীবনের সমস্ত তাঁপ নিঃশেষে মুছিয়া গেল। তাহাদের গ্রামের তীরে নদী প্রবাহিতা, সে-নদী কত আপন, কত আত্মীয়। দেখিতে দেখিতে হু হু করিয়া তাহার গায়ে বাতাস লাগিয়া সর্ব্বশরীর জুড়াইয়া গেল। স্নান করিবার ভাঙাঘাটের কাছে আসিয়া সত্যবালা দাঁড়াইল।

চোখে তাহার জল চক চক করিতেছিল। হয়ত নিবিড় বেদনায়, হয়ত নিগূঢ় অভিমানে। নদীর প্রতি

অভিমান, কারণ, এমনি এক নদী তাহাদের গ্রামের নিকট দিয়া প্রবহমানা। সেই নদীতে সে কত ঘট ভরিয়াছে, কত ডুব দিয়াছে, কত আনন্দের মুহূর্ত্ত অতিবাহিত করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। সেই নদী হইতে সে আজ বিচ্ছিন্ন।

আর তাহার কোথাও যাইতে ইচ্ছা হইল না, শীতের রৌদ্রের দিকে পিছন ফিরিয়া সে ঘাটের ধারে বসিয়া রহিল। বসিয়া বসিয়া কতক্ষণ যে কাটিয়া গেল, বুঝিতে পারিল না। কেহ কেহ স্নান করিতে আসিল, আপন আপন কাজ সারিয়া চলিয়াও গেল। তাহাদের কণ্ঠের কিছু কিছু মন্তব্য তাহার কানে আসিল, কিন্তু সে সাড়াও দিল না, পিছন ফিরিয়াও চাহিল না। অনেক দিন আগে স্বামীর সহিত একত্র দীক্ষা লইয়াছিল; মনে মনে সেই ইষ্টমন্ত্র জপ করিতেছিল।

এক সময়ে যেন কাহার গলার আওয়াজে সে ফিরিয়া চাহিল। দেখিল, লোকজনের ভিড়ের ভিতরে দাঁড়াইয়া একটি বউ তাহাকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছে, তখন থেকেই বাঙালীমেয়ে ব'লে ঠাওর হচ্ছে, তুমি ওখানে বসে কেন গা? বলি, বাঙালীই ত?

সত্যবালা ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল।

কেউ নেই সঙ্গে ? কোথা যাবে ?

সত্যবালা কহিল, বেরিয়েছি তীর্থে, যাবো অনেক দূর।

ওমা, আমাদেরও সেই দশা। উনি রেলের পাশ পান্, বড় চাক্‌রি কিনা, আমরাও বেরিয়ে পড়েছি ঘুরতে। চলো না ভাই, ভৈরবনাথ দর্শন ক'রে আসি। আবার কবে আসা হবে তার ত ঠিক নেই, এযাত্রায় সেরেই যাই।

খুসী হইয়া সত্যবালা কহিল, আমারো সেই ইচ্ছে। আচ্ছা, এই থলিটা কি আপনাদের ? হারিয়েছিল ?

বউটি মাথা হেঁট করিয়া থলিটা উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া কহিল, না ভাই, এসব আমাদের নয়। আহা, এত টাকা! কা'র না কা'র সর্ব্বনাশ হয়েছে, কে জানে। তুমি কোথায় পেলে ?

ইষ্টিশানে প'ড়ে ছিল।

দুজনেই দুজনের মুখের দিকে চাহিল। কিন্তু ভালো করিয়া তাকাইয়া বউটি টাকার থলির আলোচনাটা ভুলিয়া গেল, কহিল, কী চোখ ভাই তোমার ? এত রূপ ! এমন বয়সে তীর্থে বেরিয়েছ কেন ? দেশ কোথায় ?

সত্যবালা ম্লান হাসিয়া কহিল, সে অনেক কথা। আমাকে সঙ্গে নেবেন আপনারা ?

তা ত নিতেই পারি, কিন্তু তোমাকে ত ভাই আমরা চিনিনে। যদি ধরো কোনো গণ্ডগোল হয়—

কি যেন ভাবিয়া সত্যবালা কহিল, আচ্ছা তবে থাক্।

এমন সময় বৌটির স্বামী আসিয়া দাঁড়াইলেন। কোলে তাঁহার একটি শিশুসন্তান। কাঁধে কতকগুলি শীতবস্ত্র। বলিলেন, জলস্পর্শ করা হোলো তোমার? গাড়ীর আর দেরী নেই।

হ্যাঁ, হয়েছে। ওগো, এই ছাখো কাদের একটি মেয়ে—রূপ দেখলে ভয় করে, না গো? সেই ব্রজেনবাবুর বৌকে তোমার মনে পড়ে? অনেকটা তার মতন আদল আসে। যাবে বলছে ভৈরবনাথ দর্শন করতে, নেবে সঙ্গে?

স্বামী কহিলেন, কা'র সঙ্গে এনেছেন উনি?

কেউ নেই, একলা। বোধহয় বোষ্টম। মুখ দেখলে মনে হয় এখুনি বুঝি কাঁদবে। হয়ত পথ ঘাট চেনে না। হ্যাঁ ভাই, তুমি রাঁধতে জানো?

সত্যবালা মাথার কাপড় একটু টানিয়া দিয়া কহিল, জানি।

তাহলে ত ভালই হয়, ছেলে নিয়ে আমি বাপু পেরে উঠিনে। আজ চারদিন হোলো উনি পুরি চিবিয়ে

আছেন, আমারো তথৈবচ। ছেলেটাকে একটু আধটু ধরতে পারবে ত?

স্বামী হাসিয়া কহিলেন, তুমি ওঁকে চাক্‌রিতে বহাল করছ নাকি?

আহা-হা, সঙ্গে সঙ্গে যাবে, খাবে থাকবে, কাজ কিছু ক'রে দেবে না? এমনি এমনি কেউ কিছু করে কারুর জন্যে?

সত্যবালা কহিল, আমি সবই পারি।

স্বামী কহিলেন বেশ, তবে দরখাস্ত মঞ্জুর হোলো, আমি এবার ভাত খেয়ে বাঁচব। ছেলেকে বিশেষ ধরতে হবে না, এ প্রায় আমার কাছেই থাকে। আর রান্না? তরকারিগুলো আলুনি না থাকলেই আমি খুসি থাক্‌ব। তবে আর দেরি নয় যাওয়া যাক্‌।

ঘাটের কাজ সারিয়া তাঁহারা চলিতে লাগিলেন, সত্যবালা একটু দূরে থাকিয়া তাঁহাদের পাশে পাশে চলিল।

বৌ কহিল, ওগো শোনো, ভালো কথা, ও একটা বগ্‌লি কুড়িয়ে পেয়েছে, ইষ্টিশানে নাকি প'ড়ে ছিল, দেখলুম টাকা আছে অনেকগুলো।

তাই নাকি? বেশ বেশ, কপাল ওঁর ভালো।

মাজ ত বেস্পতিবার, লক্ষ্মী দয়া করেছেন। পথে ঘাটে চাজে লেগে যাবে,—ধর্ম্মপথে থাকলে অর্দ্ধেক রাতে অন্ন!

সত্যবালা থলিটা বৌটির হাতে দিয়া কহিল, কোনো ভয় নেই, এটা আপনারা রাখুন।

বৌটি হাসিয়া কহিল, গেরস্থ মানুষ, যদি খরচ ক'রে ফেলি ?

সত্যবালা এবার একটু হাসিল। চুপি চুপি কহিল, তাহলে নালিশ করব আপনার জজ সায়েবের দরবারে।

বৌ কহিল, তোমার নাম কি ভাই ?

সত্যবালা।

বেশ নাম। আমার নাম হেমাঙ্গিনী, কিন্তু নামটা আমার নিজের পছন্দ নয়। রূপ নেই কিনা তাই মা-বাপ শত্রুতা ক'রে রেখেছিলেন এমন নাম! ওঁর নামটি কিন্তু বেশ।

'ওঁর' নাম শুনিবার আগ্রহ বিশেষ সত্যবার ছিল না, কিন্তু হেমাঙ্গিনী নিজেই আনন্দ করিয়া কহিল, বিজয়কুমার রায়, শুনতে ভালো নয় ?

সত্যবালা চলিতে চলিতে তাহাকে খুসি করিবার জন্য কহিল, ভারি চমৎকার।

এতখানি প্রশংসা তাহার মুখ হইতে শুনিয়া হেমাঙ্গিনী

কিন্তু বিশেষ খুসি হইল না। কহিল, আমার মতন আপন আর ওঁর কে আছে বলো। রেখে যেতে পারি, তবেই ত। একটু জোরে জোরে হাঁটো ভাই, আমাদের আর সময় নেই।

সত্যবালা দ্রুতপদেই হাঁটিতে লাগিল। হেমাঙ্গিনী পুনরায় কহিল, খাওয়ার কিন্তু কষ্ট হবে তা আগে থেকেই ব'লে রাখি। বিদেশে এসে অত খুঁৎখুৎ করলে চলবে না।

বিজয়বাবু হাসিলেন। কহিলেন, অভিযোগটা আরোপ ক'রো না ওঁর ওপর। তোমার আশ্রয়ে এসেছেন, তুমি যা ব্যবস্থা করবে তাই উনি মেনে নিতে বাধ্য।

হ্যাঁ, তা ত বটেই।—হেমাঙ্গিনী কহিল, আর এক কথা, বাসন ক'খানা কিন্তু ভাই তোমাকেই মেজে নিতে হবে, ছেলে নিয়ে আমি অত পেরে উঠ্‌ব না।

স্ত্রীর দিকে চাহিয়া বিজয়কুমার পুনরায় হাসিলেন, কটাক্ষ করিয়া কহিলেন, ঠিকই ত, তোমার ব্যবস্থা উনি মেনে নিতে বাধ্য, একশোবার বাধ্য; কারণ, মা-গঙ্গা সাক্ষী, তুমি ওঁকে দুর্দিনে আশ্রয় দিয়েছ।—পরে তিনি সত্যবালার দিকে চাহিয়া কহিলেন, পারবেন ত এত কাজ?

সত্যবালা কৌতুক বোধ করিয়া কহিল, যদি না পারি জামাইবাবু ?

যদি না পারেন ? তবে বোনের কাছে গলাধাক্কা খেতে প্রস্তুত থাকুন। উনি বড় সরল মানুষ !

হেমাঙ্গিনী উদ্বিগ্ন হইয়া স্বামীর পাশে গিয়া তাঁহার হাত ধরিল। ফিস ফিস করিয়া কহিল, অত কথা ক'য়োনা তুমি ওর সঙ্গে, ভারি বেলয় তুমি। তোমার কথায় আমি যেন খেলো হয়ে যাই।

ভারি অন্যায়—বলিয়া বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বিজয়বাবু অগ্রসর হইলেন।

ষ্টেশনেই তাঁহাদের জিনিষপত্র ছিল। এদিকে আলাপ-আলোচনা করিতে কিছু দেরী হইয়া গেছে। জিনিষপত্র লইয়া সকলে যখন গাড়ীতে উঠিল তখন গাড়ী ছাড়িতে আর বিশেষ বিলম্ব নাই।

সত্যবালা একপাশে গিয়া বসিতেছিল, হেমাঙ্গিনী বাধা দিয়া কহিল, ওখানে নয়, উনি বসবেন ওখানে, পুরুষ মানুষকে ভালো জায়গাটা দিতে হয়। তুমি ভাই এদিকটায় এসো, আমার এপাশে।

সত্যবালা লজ্জিত হইয়া উঠিয়া দূরে গিয়া একস্থানে

বসিয়া পড়িল। হেমাঙ্গিনীর গলার আওয়াজটা বিজয়-বাবুর ভালো লাগে নাই। কিন্তু স্ত্রীর চরিত্র তিনি জানেন, অতএব তাহার মুখের দিকে একবার চাহিয়া মুখ ফিরাইয়া লইলেন।

হেমাঙ্গিনীর কোলে ছেলে ছিল, এবার সে ছেলেটিকে সত্যবালার কোলে গছাইয়া দিয়া কহিল, আর ছুটি দেবো না ভাই, ছেলে নিয়েই তুমি থাকো। এই দুধের বোতল, এই নাও চুষিকাঠি। ছোট ছেলেপুলে নিয়ে বেড়াতে বেরুনো ভারি ঝঞ্ঝট। ভালো কথা, তোমার টাকা থেকেই তোমার গাড়ী ভাড়া দিয়েছি। ছিল তেত্রিশ টাকা ন' আনা, তার থেকে গেল একটাকা তেরো আনা। ওঁর ভাই এখন নানা খরচ, তা ছাড়া পথে বেরুনো হয়েছে,—নৈলে সামান্য এক টাকা তেরো আনা ওঁর একদিনের পকেট খরচাও নয়,—দিয়েই দিতেন।

সত্যবালা কহিল, ওটাও ত আমার টাকা নয়। আপনারা যা ব্যবস্থা করবেন তাই হবে।

হ্যাঁ, তাই ত হবে, তবু অতটা নির্ভর করা ভালো নয়। আমরা তোমার কীই বা করতে পারি বলো। যাই হোক, তোমার হিসেবটা তুমি ঠিক রেখো দিদি। বলিয়া হেমাঙ্গিনী স্বামীর পাশে গিয়া ফিস ফিস

করিয়া কহিল, ছুঁড়ির ব্যাঁকা ব্যাঁকা কথা শুন্‌লে ? অভদ্দর !

ভয়ানক !—বলিয়া বিজয়বাবু টাইম্ টেব্‌লের প্রতি মনঃসংযোগ করিলেন।

তুমি হেসো না বাপু সব কথায়। আমি যেন খেলো হয়ে যাই। সবাই সব কথা বোঝে না, তোমার মুখের চেহারা দেখলে ও যদি প্রশ্রয় পেয়ে যায় ?

বিজয়বাবু কহিলেন, মুখ ফিরিয়ে বসব ?

তাই বসো, দেখোনা ওদিকে। দেখো, ছুঁড়ির কিন্তু স্বভাবচরিত্র ভালো নয়, এই আমি ব'লে রাখলুম।

কৃত্রিম অভিনয় করিয়া বিজয়বাবু কহিলেন, তাই নাকি ? আমারো তাই মনে হচ্ছিল, নৈলে তোমাকে অমন ব্যাঁকা ব্যাঁকা কথা শোনায় ? আশ্চর্য্য, তুমি ত ঠিক ধরেছ ! কি দৃষ্টি ! দাও ওকে তাড়িয়ে, বুঝলে ?

গাড়ী ছাড়িয়া দিয়াছিল। তাহার পথের দিকে চাহিয়া তিনি পুনরায় কহিলেন, পরের ষ্টেশনেই নামিয়ে দাও, নৈলে তোমাকে ভীষণ জ্বালাবে, মাথা খারাপ করে দেবে। শোনো আমার কথা, বুঝলে, গলাধাক্কা দাও, এত বড় আস্পর্দ্ধা !

মুখের একটা শব্দ করিয়া হাসিয়া হেমাঙ্গিনী কহিল, যাচ্ছে চলুক, আহা, দুরাবস্থায় পড়েছে। কিন্তু আমি বাবা সামান্য মেয়ে নই, হাঁচি কাসি সব বুঝতে পারি, অল্পে ছাড়ব না। ছুঁচ বিক্রি করতে কোথায় এসেছে জানে না ত! থাক্ এখন, পরের কথা পরে।

তবে থাক্। বলিয়া বিজয়বাবু বইখানা নাড়াচাড়া করিতে লাগিলেন।

এদিকে আসিয়া হেমাঙ্গিনী পুঁটুলি খুলিয়া কি যেন বাহির করিল, পরে বলিল, ওমা, গরম কোল পেয়ে নাটু যে ঘুমিয়ে পড়ল, খাইয়েছিলে ত?

সত্যবালা কহিল, হ্যাঁ, অল্পই খেয়েছে।

এই নাও ভাই, গয়ায় গিয়েছিলুম, এই সেখানকার তিলকুটো। আমাদের আবার এসব খাওয়া অভ্যেস নেই, তবু পাণ্ডা বেটারা দিলে গছিয়ে। খাও ভাই, পরের ইষ্টিশানে জল একঘটি চেয়ে দেবো'খন।

হাত পাতিয়া সত্যবালা খাবার লইল।

হেমাঙ্গিনী তৎক্ষণাৎ স্বামীর পাশে গিয়া দাঁড়াইল, অলক্ষ্যে ফিস ফিস করিয়া কহিল, ওমা, কি হ্যাংলা গো, ছোঁ মেরে হাত থেকে তিলকুটো কেড়ে নিলে, একটু আপত্তি জানালে না। চুরি ক'রে খেয়ে আমাদের ভুট্

করবে দেখছি। রূপ না ছাই, শিমূ ফুল! গুণ না থাকলে পুরুষ মানুষ বশ হয় না।

ঠিক বলেছ। বলিয়া বিজয়বাবু হাসিলেন।

গাড়ী চলিতে লাগিল। ষ্টেশনের পর ষ্টেশন পার হইতেছিল। বেলা বাড়িয়া চলিয়াছে। নাটুকে কোলে লইয়া সত্যবালা বাহিরের পথ-প্রান্তরের দিকে স্তিমিত দৃষ্টিতে চাহিয়া নিঃশব্দে বসিয়া ছিল। তাহার স্বামী-শ্বশুর কুলের অখণ্ড পুণ্য-প্রভাবে একটা আশ্রয় তাহার মিলিয়া গেল। ঠাকুরের চরণে শতকোটি প্রণাম।

হেমাঙ্গিনী গায়ে কম্বল মুড়ি দিয়া বসিয়া ছিল। গতরাত্রে ভাল ঘুম হয় নাই বলিয়া তাহার চোখ বুজিয়া আসিতেছিল, কিন্তু ঘুমাইতে তাহার সাহস হইল না। 'স্বভাব চরিত্র' যাহার ভালো নয় তাহার দিকে সতর্ক প্রহরায় নিযুক্ত থাকিয়া চোখ টানিয়া টানিয়া সে জাগিয়া রহিল।

প্রতি বৎসর শীতের একটা বিশেষ সময়ে ভৈরবনাথের মেলা বসে। নানা দেশ হইতে যাত্রীর সমাগম হয়। পনেরো কুড়ি দিন ধরিয়া উৎসব চলিতে থাকে।

হিন্দুস্থানী এক পাণ্ডার বাড়ীতে বিজয়বাবু সপরিবারে আসিয়া উঠিয়াছিলেন। ছুটি ফুরাইতে এখনও অনেক

দেরি, এখানে তাঁহার কয়েকদিন থাকার ইচ্ছা। তাঁহার পিতা এই জেলায় সরকারি চাকরি করিতেন, এবং এই ভৈরবনাথ সম্বন্ধে তাঁহাদের পরিবারে নানা অদ্ভুত গল্প প্রচলিত।

অস্থায়ী ও সাময়িক ঘরকন্না, কিন্তু ইহাকেই সুশৃঙ্খলে গুছাইয়া তুলিতে হেমাঙ্গিনীর বিলম্ব হয় নাই। তাহার নিজের শারীরিক পরিশ্রম করিবার প্রয়োজন ছিল না, সত্যবালা সকল কাজই তাহার হাত হইতে কাড়িয়া লইয়াছে,—এদিকে রান্না হইতে বাসন মাজা পর্য্যন্ত, এবং ওদিকে শয়নকক্ষ হইতে সদর অবধি। সত্যবালার স্বাস্থ্যের দিকে চাহিয়া বিজয়বাবু অবাক হইয়া যাইতেন।

একদিন হাসিয়া কহিলেন, কি যেন একটা সংস্কৃত শ্লোক আছে, মনে পড়ে সত্যবালা ?

সত্যবালার কণ্ঠ হইতে উত্তর বাহির হইবার পূর্ব্বেই হেমাঙ্গিনী ঝাঁ করিয়া কহিল, তোমার বিদ্যের সঙ্গে ওর তুলনা ? তুমি না হয় তিনটে পাস করেছ, ও জানে কী।

বিজয় কহিলেন, তাই বলছি—'মা ফলেষু কদাচন।' তোমার এ পরিশ্রমের কোনো দাম নেই সত্যবালা, সুনামটা এসে জমছে হেমাঙ্গিনীর ঝুলিতে।

সত্যবালা এবার হাসিয়া কহিল, সুনামের জন্যেই বুঝি মেয়েরা পরিশ্রম করে জামাইবাবু?

ওমা, তাই ত করে গো, তোমার কি বুদ্ধি ভাই? এই যে আমি তোমাকে পথ থেকে তুলে আনলুম, সে ত' কেবল ওঁর কাছে সুখ্যাতি পাবো ব'লে, আর উনি যে তোমাকে খেতে পরতে দিচ্ছেন এ ত' কেবল লোকের কাছে—

বলিতে বলিতে হঠাৎ হেমাঙ্গিনী শ্রোতা ও শ্রোত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া গেল। কথাগুলি যেন তাহার নিজের কানেই খারাপ হইয়া বাজিতে লাগিল। বিজয়বাবু আর কথা বাড়াইলেন না, স্ত্রীর মুখের দিকে একবার চাহিয়া অন্যত্র উঠিয়া গেলেন।

হেমাঙ্গিনী তাঁহার পথের দিকে একবার তাকাইল তারপর নিজের মুখভাবকে যথাসম্ভব সহজ করিয়া কহিল, উনি অমনিই, মেয়ে মানুষকে বিশেষ আস্কারা দেন না। একটা দুটো কথা, ব্যস,—নিজের কাজ নিয়েই উনি ব্যস্ত, গল্প গুজব করবার সময় নেই। স্বভাবটি, বুঝলে ভাই, একেবারে মহাদেব, কোনদিকেই ভ্রূক্ষেপ করেন না। ওঁকে খুসি করতে হ'লে অনেক জন্মের তপিস্যে দরকার।

খুসি করিবার দরকার সত্যবালার নাই। যাহাদের নিকট আশ্রয় তাহার মিলিয়াছে, নিশ্চিন্তে তাহাদের

দাসীবৃত্তি করিতে পাইলেই সে কৃতার্থ। হেমাঙ্গিনীর সহিত কথা বাড়াইতে তাহার সাহস হইল না, এই কয়দিনে সে তাহাকে যথেষ্টই চিনিতে পারিয়াছে। কোন্ কথা কি ভাবে বাঁকিয়া যাইবে ইহাই ভাবিয়া সে ভয়ে ভয়ে নীরব হইয়া রহিল। মানুষকে আর সে বিশ্বাস করিতে পারে না।

উত্তর সে দিল না দেখিয়া হেমাঙ্গিনী উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। তাহার এই নির্ব্বাক নীরবতার অন্তরালে হয় ত ভয়ানক কিছু একটা রহস্য আছে মনে করিয়া সর্ব্বশরীর তাহার জ্বালা করিতে লাগিল, কিন্তু প্রমাণ কিছু না পাইলে অভিযোগ আরোপ করাই বা যায় কি প্রকারে? আশ্রিতকে অপমান করিবার কারণ এখনও সে খুঁজিয়া পায় নাই। কি যেন ভাবিয়া সে উঠিয়া ঘরে চলিয়া গেল।

বিজয়বাবু বিছানার ধারে বসিয়া বাহিরের দিকে তাকাইয়া ছিলেন। হেমাঙ্গিনী তাঁহার কাছে বসিয়া পড়িয়া কহিল, দেখলে ত, যা বলেছিলুম ঠিক তাই, একবারে মিটমিটে ডান! অপমান করলেও কথা কয় না, ছেলে খাবার রাক্কোস! ওকে আবার বিশ্বাস! তুমিও যেমন, ওর কাছে বলতে গেছ শাস্তরের কথা!

বিজয়বাবু মৃদু কঠিন কণ্ঠে কহিলেন, তোমার নিজের কাজে যাও।

যাই, তোমার জন্যে চা ক'রে আনিগে। বলিয়া হেমাঙ্গিনী উঠিয়া দাঁড়াইল কিন্তু তখনই 'কি মনে করিয়া স্বামীর কাঁধে হাত রাখিয়া কহিল, তোমার মন বুঝি ভালো নেই।

না। বলিয়া বিজয়বাবু তাহার হাতখানা সরাইয়া দিলেন। কণ্ঠে বোধ করি তাঁহার কিছু বিরক্তি মিশ্রিত ছিল, তাহা হেমাঙ্গিনীর কর্ণ অতিক্রম করিয়া মর্ম্মে গিয়া পাক খাইতে লাগিল। প্রথমটা সে কথা কহিল না, তারপরেই সে অভিমানরুদ্ধ স্বরে কহিল, মন যাতে ভালো হয় তাই করলেই পারো ?

হাওয়া কোন্‌দিকে বহিতেছে তাহা বিজয়বাবু বুঝিলেন। অত্যন্ত সৌজন্য ও ভদ্রতা সহকারে কহিলেন, মনের চেহারা জানতে চেয়ো না হেম, খুসি হবে না। যাও, চা আনো।

হেমাঙ্গিনী চিন্তিত মনে চা আনিতে চলিয়া গেল।

গরম বিছানায় শুইয়া নাটু ঝুমঝুমি লইয়া খেলা করিতেছিল, তাহারই কাছে মেঝের উপর বসিয়া সত্যবালা চা'লের কাঁকর বাছিতেছিল। এইবার গিয়া সে রাত্রের

রান্না চড়াইবে। অদূরে ষ্টোভের আগুনে চায়ের জল গরম হইতেছে।

হেমাঙ্গিনী দ্রুতপদে ঘরে ঢুকিয়া কহিল, এখনো জল ফোটাতে পারোনি? তুমি ভাই বড় নিড়বিড়ে, একটা কাজও তোমাকে দিয়ে তাড়াতাড়ি হবার জো নেই।

কেন দিদি, এখনো ত চারটে বাজেনি। এই বলিয়া সত্যবালা তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল।

ওই, তুমি কেবল কথার খুঁৎ ধরবে। চারটের সময় চা করতে বলেছি, ঘাট হয়েছে, আমাকে মাপ করো। ওই ত ঘড়ি, পনেরো মিনিট না হয় আর বাকি, একই ত কথা ভাই!

আচ্ছা, আপনি বসুন, আমি দিচ্ছি ক'রে।

থাক্ থাক্, আমাকে আর বসাতে হবে না। তুমি কথায় কথায় কাজ দেখিয়ো না সত্যবালা। আমি বসব, আর তুমি গিয়ে চা দিয়ে আসবে? কেন বলো ত? আমি ছাড়া কারো হাতে উনি কিছু খান্ না। বলিয়া হেমাঙ্গিনী দুম্ করিয়া গরম জল নামাইয়া তাহাতে চা ফেলিয়া দিল।

সত্যবালা স্তম্ভিত হইয়া তাহার দিকে তাকাইয়া রহিল। চক্ষু দুইটি তাহার জ্বালা করিয়া জল আসিতে

চাহিল। মনে হইল বিষধর সর্পের গহ্বরে সে আসিয়া নামিয়াছে।

হেমাঙ্গিনী বলিতে লাগিল, মানুষটাকে সারিয়ে তুলতে নিয়ে এসেছি বিদেশে, দেশে ওঁকে কত ঝক্কি পোয়াতে হয়। মাইনে ত মোটে একশো পঁচিশটি টাকা, সায়েবের সুনজরে আছেন তাই সুরাহা। মা বলো, মাসি বলো, বোন বলো, হাত সবাই ওঁর কাছে পেতেই আছে! একটা মানুষের ওপর অত্যাচার—আমার সঙ্গে তাদের এতটুকু বনে না। আদ্ধেক টাকা নিয়ে নিজের নামে পাঠিয়ে দিই পোষ্টাপিসে। অমন স্বামী অনেক তপিস্যেয় মেলে। বললে বড়াই করা হয়, আমাকে নৈলে ওঁর একদণ্ডও চলে না। কই, কেউ করুক দিকি আমার মতন? এই ত, একটু জ্বর হয়েছে আমার সকাল থেকে, ওঁকে কি আর জানতে দেবো? অন্য মেয়ে হ'লে এতক্ষণ হাট বাধিয়ে বসত। আমি তাই—

সত্যবালা কহিল, জ্বর হয়েছে আপনার?

সামান্য, সেই পুরোনো ম্যালেরিয়াটা—তাই ব'লে মনে করো না আমি বেহুঁস হয়ে প'ড়ে থাকব, চোখ থাকবে আমার সব দিকে।—এই বলিয়া চা'য়ে বেশি করিয়া চিনি মিশাইয়া চা লইয়া হেমাঙ্গিনী উঠিয়া দাঁড়াইল।

মুখ তুলিয়া সত্যবালা কহিল, আপনার চা এখানেই রাখ্‌ব?

হাঁ, তুমিও একটু খাও, যে শীত।

আমি ত চা খাইনে দিদি।

খাও না? সে আবার কি ভাই? তোমার সবতাতেই ভিরকুটি। যাই খেতে বলি তুমি খেতে চাও না। উপোস ক'রে কাজ দেখিয়ে কি ওঁর কাছে নাম কিন্‌তে চাও?—বলিয়া হেমাঙ্গিনী তীক্ষ্ণ হাসি হাসিয়া পুনরায় কহিল, সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে, বুঝলে দিদি?—বলিয়া সে সর্ব্বশরীর দোলাইয়া চলিয়া গেল।

রাত্রে হেমাঙ্গিনীর জ্বর একটু বাড়িল। এমন তাহার প্রায়ই হয়। দুই চারিদিন জ্বর ভোগ করিয়া আবার সে সারিয়া উঠে। তাহারই স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য বিদেশে আসা, বিজয়বাবুর জন্য নয়। সে যাই হোক, ব্যবস্থা হইল যে নাটু সত্যবালার নিকট রাত্রে শুইবে। অনেক ইতস্ততঃ করিয়া হেমাঙ্গিনী ছেলেকে সত্যবালার নিকট রাখিতে সম্মত হইল। সত্যবালা খুসি হইয়া নাটুকে লইয়া পাশের ঘরে চলিয়া গেল। যাইবার সময় বিজয়বাবু তাহার হাতে একটি লেপ তুলিয়া দিলেন। হেমাঙ্গিনী

তাহাতে অস্পষ্ট যে মন্তব্যটা করিল তাহা আর শুনিয়া লাভ নাই।

ঘরে টিপ টিপ করিয়া প্রদীপ জ্বলিতেছে। বাহিরের চারিদিকে রাত্রির দিগন্তব্যাপী নীরবতা। পাশের ঘরে স্বামীস্ত্রীর কথাবার্ত্তা দেখিতে দেখিতে থামিয়া আসিল। আজ অনেকদিন পরে একটি শিশুকে কাছে পাইবার সৌভাগ্য তাহার হইয়াছে। কিন্তু সৌভাগ্য হইলেও মুখে তাহার হাসি আসিল। নিজের সন্তানটির উপর অধিকার সে হারাইয়াছে, জীবনেও তাহাকে আর দেখিবার সম্ভাবনা নাই। এই শিশুটি—এটিও তাহার বঞ্চিত মাতৃত্বকে ছলনা করিতে আসিয়াছে তাহা সে জানে তবুও সে হাসিয়া হাসিয়া সেই ক্ষণিক শিশু-অতিথির নিদ্রিত মুখের উপর দু'তিনটি চুম্বন করিল।

রৌদ্রতপ্ত শয্যার উপর নাটুকে অপরিসীম যত্নে শোয়াইয়া সত্যবালা বহুক্ষণ নিশ্চল হইয়া বসিয়া রহিল। আজকার রাতটি তাহার নিকট অনেক মূল্যবান, ঘুমাইতে তাহার ইচ্ছা হইল না। মনে হইল, দুঃখ বেদনা মনোক্ষোভ তাহার আর কিছুই নাই, সে নিষ্কলঙ্ক, দেহে মনে সত্তায় কোথাও কোনো ক্লেদ নাই, লাঞ্ছনা ও উৎপীড়ন তাহার শুচিতাকে কোনোদিন বিন্দুমাত্রও স্পর্শ

করে নাই। সকলের চেয়ে আশ্চর্য্য এই, এ যেন সেই মল্লিকপুর গ্রাম, এই তাহাদের বাড়ীঘর, এই তাহার সন্তান, স্বামীর আগমন-প্রতীক্ষায় সে যেন নীরবে বসিয়া রহিয়াছে।

কিন্তু সারাদিন পরিশ্রমের পর চোখ দুইটি তাহার একসময়ে আপনা হইতেই বন্ধ হইয়া আসিল, সে আর বসিতে পারিল না, নাটুকে একেবারে বুকের ভিতরে লইয়া সে লেপ মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িল। ইহাকে যদি সে চিরদিন এমনি করিয়া কাছে রাখিতে পারে তবে হেমাঙ্গিনীর শত লাঞ্ছনাও তাহার গায়ে লাগিবে না। নিজেকে সে নিরাপদে রাখিতে পারিবে ইহাই তাহার সান্ত্বনা। যাহারা আশ্রয় দিয়াছে তাহাদের দুই চারিটা কটূক্তি যেমন কবিয়াই হউক সহ্য হইয়া যাইবে। ঠাকুরের চরণে সে মনে মনে প্রণাম জানাইল।

ঘুমাইয়া পড়িয়াও একসময়ে ছাঁৎ করিয়া সত্যবালার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। কোথায় সে যেন একটা অস্বস্তি বোধ করিতেছে। তাহার বুকের কাছটা ঠাণ্ডা—ভয়ানক ঠাণ্ডা, যেন বরফ জমিয়া গিয়াছে,—তাহার সমস্ত হৃদয়, সমস্ত ভবিষ্যৎ অসাড়, ইহাদের ভিতরে আর চেতনা খুঁজিয়া পাইবার উপায় নাই।

আলোটা তেমনি জ্বলিতেছে, রাত্রি তেমনি নীরব, নাটুর চোখে নিশ্চিন্ত নিদ্রা,—তবে? সত্যবালা এদিক ওদিক তাকাইল। বিছানা পরীক্ষা করিল, লেপের তলায় নাটুর গায়ে হাত রাখিয়া দেখিল। দেখিল ছেলেটার গলার কাছটা ভিজা। হঠাৎ নিজের দিকে নজর পড়িতেই সে বুকের উপর হাত দিয়া অনুভব করিল, তাহারই বক্ষবাস সিক্ত—নিদ্রার ঘোরে কখন্ যে আপন স্তনদুগ্ধের ধারায় কাপড় চোপড় ভিজিয়া একাকার হইয়াছে তাহা সে কিছুই বুঝিতে পারে নাই।

শিশুসন্তানের সুখস্পর্শ পাইয়া যাহা এই গভীর রাত্রে ঘটিয়া গেল ইহার জন্য লজ্জা করিবে সে কাহাকে? মলিন হাসি হাসিতে গিয়া সত্যবালার গলার ভিতরে যেন হাসি আট্‌কাইয়া গেল এবং দেখিতে দেখিতে তাহার নিপীড়িত নির্য্যাতিত মাতৃহৃদয় মথিত করিয়া দরদর ধারায় চোখের জল নামিয়া আসিল।

কিন্তু কুইনিন্ খাইয়াও হেমাঙ্গিনীর জ্বর ছাড়িল না বরং সেদিন সকাল হইতে আরও দুই এক ডিগ্রী উঠানামা করিতে লাগিল। তাহাকে শয্যাগ্রহণ করিতে দেখিলেও বিজয়বাবুর বিশেষ দুশ্চিন্তা দেখা গেল না। এ আজ

নূতন নয়, গত তিন বৎসর ধরিয়া স্ত্রীর চিকিৎসা চলিতেছে। হাওয়া বদলাইবার প্রধান কারণ, ঔষধে আর হেমাঙ্গিনীর কুলাইতেছে না। প্রথম দুইটি ছেলেমেয়েকে তাহাদের ঠাকু'মার কাছে রাখিয়া আসিতে হইয়াছে। মা ছাড়িয়া তাহার ঠাকু'মার কাছেই ভালো থাকে।

ছেলেকে মায়ের কাছে রাখিয়া সত্যবালা সংসারের সমস্ত কাজকর্ম্ম করিয়া দিতেছিল। রোগীকে দেখাশুনা, ঔষধ-পথ্য ইত্যাদি পরিচর্য্যা,—ইহাতেও তাহার ত্রুটি নাই। শ্বশুরবাড়ীর অতবড় সংসার একা সে-ই পরিচালনা করিত।

বিজয় বাবু নানাদিকে তদ্বির করিতেছিলেন। নূতন ছোক্‌রা চাকর, সে বাজার-হাট করিয়া দিল। হেমাঙ্গিনী কহিল, তুমি আমার কাছে বসে থাকো। অত মেহন্নৎ করছ, তোমার যদি শরীর খারাপ হয়?

বিজয় বাবু কহিলেন, তোমার বোনের ওপর সব ছেড়ে দিয়ে ব'সে থাকা কি ভদ্রতা হবে?

হেমাঙ্গিনীর গা জ্বলিয়া গেল। কহিল, তাই ব'লে তুমি যাবে রান্নাঘরে? কাজ ত ছাই। রামার মা রামী,—পুরুৎ-বামুন আর আমি! তিনটি মানুষের

রান্না—এই নিয়ে ত দেখছি বাড়ীতে কাক-চিল পড়ল! ঢং দেখে আর বাঁচিনে। সুখের পায়রা যে, সে আসে কেন পরের বাড়ী চাক্‌রি করতে?—আঃ মাথাটা ছিঁড়ে পড়ছে জ্বরে—তা হোক, আমাকেই উঠতে হোলো দেখছি।

অমন কাজ ক'রো না হেম, শুয়ে থাকো। নড়াচড়া করলেই জ্বর কিন্তু বাড়বে। আমি যাই একবার পাণ্ডার ওখান থেকে হয়ে আসি।

হুঁা, তাই যাও। হেমাঙ্গিনী খুসি হইয়া কহিল, ভালো, থেকো না বাড়ীতে, জ্বরের হাওয়া খারাপ। বাইরে থাকলেই আমি নিশ্চিন্ত,—তাই যাও, পথের হাওয়া লাগুক তোমার। খাবার সময় একবার এসো, আমার সামনে বসে খেয়ো, আবার বেরিয়ে যেয়ো। সেই ভালো! আঃ জ্বরটা বাড়ছে আবার। দুঃখু এই, তোমাকে যত্ন করিতে পারছিনে,—ওগো একটু পায়ের ধূলো দাও ত, এই ধূলোতে আমার যেন সব সেরে যায়!

আমি বাজি রেখে বলতে পারি তুমি সেরে উঠবে। বলিয়া বিজয় বাবু হাসিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

পরমুহূর্ত্তেই হেমাঙ্গিনী ডাকিল, সত্যবালা? অ সত্য-বালা, ও ভাই শুন্‌চ? কোথায় গেলে, অ সত্যবালা?

উত্তর না পাইয়া ক্ষিপ্ত হইয়া সে লেপ ও বিছানা সুদ্ধ উঠিয়া হুমড়ি খাইয়া দরজার নিকট পড়িল। সত্যবালা ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া হাজির।—কি দিদি? ওমা, উঠেছেন কেন?

কেন উঠেছি?—চীৎকার করিতে গিয়া হেমাঙ্গিনী হাসিয়া ফেলিল। কহিল, জানো না? একা মানুষ তুমি, এতবড় সংসার, পেরে উঠবে কেন ভাই? বলি যাই কুট্‌নোগুলো অন্তত কুটে দিইগে; কোথায় গিয়েছিলে এতক্ষণ! উত্তর পাচ্ছিলুম না যে? রাস্তায় ছিলে বুঝি? ও তাই বটে, উনি কি বললেন?

সত্যবালা কহিল, আমি ইঁদারা থেকে জল তুল্‌ছিলাম দিদি।

জল তুল্‌ছিলে! ও, তাই বটে। জ্বরটা বেড়েছে কিনা, ঠিক বুঝতে পারছিনে কে কি করছে। আহা, বড় কষ্ট হচ্ছে তোমার, একটু মিছরি গালে দিয়ে জল খাও ভাই। উনি তোমাকে যা'ই বলুন আমি ত আর পর ভাবতে পারিনে।

সত্যবালা অবাক হইয়া তাহার দিকে তাকাইল। হেমাঙ্গিনী পুনরায় কহিল, তোমার হাতে উনি খেতে নারাজ, কত কি বলেন, তাই ব'লে আমি শুন্‌ব কেন?

এই নিয়ে আমার সঙ্গে ঝগড়া। আমি বললুম, সত্যবালাকে তুমি যদি অপমান করো তবে আমি বিষ খেয়ে মরব। আমাদের কপাল এমনি, বুঝলে দিদি, পুরুষরা চিরকাল পা দিয়ে থেঁৎলাবে, আর আমরা সহ্য ক'রে যাবো। ইনি তাদেরই জাত, মেয়েমানুষের ওপর ঘেন্না!

সত্যবালা কহিল, এবার ঘরে গিয়ে শোবেন চলুন।

ঘরে? কেন বলো ত! না, না ভাই, না, আমি থাক্‌ব এখানে ব'সে। রাস্তা থেকে রান্নাঘর—থাক্‌ব আগলে। জ্বরে গা জ্বলে যাচ্ছে, শুতে মন চায় না। শুলেই ঘুম আসবে, ঘুমোতে ভয় করে। তুমি এবার যাও ভাই রান্নাঘরে, কত কাজ তোমাকে কর্‌তে হবে। ওঁকে খেতে দিয়ো আমার কাছে। তুমি যেন সামনে থেকো না, উনি রাগ কর্‌বেন, বুঝ্‌লে?

সত্যবালা ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইয়া চলিয়া গেল।

কিন্তু সেদিন বিজয়বাবু আসিয়া রান্নাঘরে বসিয়াই খাইলেন, সত্যবালাকে পরিবেশনও করিতে হইল, বিজয় বাবু ভদ্রভাবে দুই চারিটা কথাবার্ত্তাও কহিলেন। বলিলেন, ভারি দুঃসময়ে তুমি এসে পড়েছিলে সত্যবালা, তুমি না থাকলে কি মুস্কিলই হোতো। এইটুকু সময়ের মধ্যে এত রান্না তুমি কখন্ রাঁধলে বলো ত?

সত্যবালা লজ্জায় চুপ করিয়া রহিল কিন্তু তাহার মুখের উত্তর শুনিবার জন্য হেমাঙ্গিনী উৎকর্ণ হইয়া বাহিরে বসিয়া ছিল। উত্তর না শুনিয়া সে আরও উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল।

সত্যবালাকে বিব্রত হইতে দেখিয়া বিজয়বাবু আর কথা বাড়াইলেন না। আহার শেষ করিয়া উঠিয়া হাসিমুখে বাহির হইয়া গেলেন।

সে রাত্রে আর হেমাঙ্গিনী চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। জ্বর তাহার কমে নাই কিন্তু নানারকম উদ্ভট কল্পনা করিয়া সে উঠিয়া বসিল। নাটুকে কোলে লইয়া বিজয় বাবু তাহার কান্না শান্ত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। একসময় কহিলেন,—ছেলেকে একটু কাছে রাখো হেম, আমি খেয়ে আসি।

ছেলেকে তাহার কাছে গছাইয়া তাহাকে ব্যস্ত রাখিয়া খাইতে যাইবার গভীরতর রহস্যটা হেমাঙ্গিনীর চক্ষে আশ্চর্য্য রকম ধরা পড়িয়া গেল। স্বামীর দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে একবার চাহিয়া হাসিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল। কহিল, একটু ব'সো, বাইরে থেকে আসছি।

পাৎলা কম্বলখানা গায়ে জড়াইয়া কি যেন একটা হাতে লইয়া সে টলিতে টলিতে রান্নাঘরে আসিল।

সত্যবালা সবেমাত্র রান্নাঘরের কাজ শেষ করিয়া বাহির হইতেছিল। হেমাঙ্গিনীকে দেখিয়া আড়ষ্ট হইয়া গেল।

হেমাঙ্গিনী হাসিয়া কহিল, অনেক চেষ্টা করলুম তোমার জন্যে, সুবিধে হোলো না ভাই—

কি দিদি?

রুটি দুখানা খেয়ে নিলেই পারতে কিন্তু আর ধৈর্য্য নেই ভাই। তুমি কিছু মনে ক'রো না। এসো আমার সঙ্গে।—বলিয়া হেমাঙ্গিনী অন্ধকার সিঁড়ি দিয়া সেই শীতের রাত্রে টলিতে টলিতে নীচে নামিতে লাগিল। সত্যবালা নিঃশব্দে তাহাকে অনুসরণ করিল।

সদর দরজার বাহিরে আসিয়া হেমাঙ্গিনী কহিল, তুমি যে উপকার ক'রে গেলে চিরদিন মনে রাখ্‌ব ভাই। উনি কিন্তু ভাই আর এক মিনিটও তোমাকে রাখতে চান না। দুপুর বেলা ওঁর কথার উত্তর দাওনি, উনি চ'টে লাল! বললেন, এই রাত্রেই সত্যবালাকে যেতে বলো। কত মিনতি করলুম কিন্তু পুরুষমানুষের রাগ কিনা—এই নাও ভাই কম্বল একখানা তোমার জন্যে এনেছি, দিদির উপহার এ তোমাকে নিতেই হবে, আর এই তোমার টাকার থলি, গোটাকত টাকা বেশীই দিয়ে

দিলুম, বিদেশ বিভূঁই, মেয়েমানুষ তুমি—কত কাজে লাগবে। আচ্ছা ভাই—

বলিয়া সে পিছন ফিরিবার চেষ্টা করিতেই অশ্রুকম্পিত কণ্ঠে সত্যবালা কহিল, কোথা যাবো দিদি এই রাতে ?

তা'ত বটেই, এত রাত। ওই যে, ওই রাস্তাটা দিয়ে মেলার মাঠ পার হয়ে গেলেই ইষ্টিশান্ পাবে ভাই। আঃ জ্বরটা বেড়েছে বড্ড, দাঁড়াতে কি ছাই পারি ?—বলিয়া হেমাঙ্গিনী ভিতর হইতে সত্যবালার মুখের উপরেই সদর দরজাটা বন্ধ করিয়া দিয়া আসিল।

বিজয় বাবু কি যেন সন্দেহ করিয়া উপরের বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। স্ত্রীকে হাসিমুখে উপরে উঠিতে দেখিয়া কহিলেন, কোথায় গিয়েছিলে হেম ?

বলি। বলিয়া মুখের হাসি টিপিয়া হেমাঙ্গিনী বিছানায় আসিয়া লেপ জড়াইয়া বসিল। কহিল, মেয়েমানুষের মন দেবতারাও জানে না। নাটুকে দাও, মাই খায়নি অনেকক্ষণ। তোমার সত্যবালা যে চ'লে গেল।

চ'লে গেল ? কোথায় ?

তা কি জানি আমি ? একটা লোক এসে নিয়ে গেল। গেরস্থ ঘরে ওসব মেয়ে কি আর টেঁকতে পারে গা ?

ওদের চেহারা ঘড়ি ঘড়ি বদলায়। নষ্ট দুষ্ট্ মেয়ে হ'লে তার আর ভাবনা কি বলো। কষ্ট কেবল আমরাই পাই।

বিজয় বাবু স্তম্ভিত হইয়া কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইলেন। তারপর একসময় হঠাৎ কহিলেন, কক্ষনো না, এ মিথ্যে।

হেমাঙ্গিনী খিল খিল করিয়া বিকারের হাসি হাসিল। কহিল, অনেক মিথ্যেই তুমি জানো না। চলো, খেতে দিইগে। আঃ জ্বরটা বোধ হয় যেন একটু কমেছে। কি দুঃখই দিলে।

দীর্ঘ চার বৎসর পরে আবার এই করুণ জীবন-নাট্যের যবনিকা উঠিল। শীত শেষ হইয়া গিয়াছে। বসন্তকালও দেখিতে দেখিতে চলিয়া গেল। গ্রীষ্মের মাঝামাঝি, তাহাকে শেষ-বসন্তও বলা যাইতে পারে। এমনি সময়ে এক সন্ধ্যায় আবার যবনিকা উঠিল।

কলিকাতার রাজপথে জন-জটলা, গাড়ী-ঘোড়ার অবিশ্রান্ত আওয়াজ, ফেরিওয়ালার চীৎকার,—ইহাদের সহিত নানা কণ্ঠের বিচিত্র কোলাহল গ্রীষ্মের সন্ধ্যাকে মুখর করিয়া তুলিয়াছে।

বড় রাস্তার কোলে একটা পথ। সেই পথের কয়েকখানা বাড়ীতে সেদিন সমারোহ কিছু বেশি। তাহার চেয়েও প্রচণ্ডতর উৎসব একখানা বিশেষ বাড়ীর দোতালার সম্মুখের ঘরখানায়। সারাদিন ধরিয়া সেখানে উৎসবের উল্লাস চলিতেছিল। সদর দরজার ধারে একখানা প্রাইভেট্ মোটর দাঁড়াইয়া আছে।

উপরের ঘরে আলো জ্বলিতেছে, পাখা ঘুরিতেছে। তাহারই নীচে পরিচ্ছন্ন শয্যার উপরে একটি বয়স্ক যুবক আড় হইয়া পড়িয়া ছিল। জাগ্রত কি নিদ্রিত তাহা বুঝিবার উপায় নাই। সম্মুখে দুইটি মেয়ে বসিয়া তাহাকে ঠাট্টা-তামাসা করিতেছিল। ঘরখানি খুব সুসজ্জিত। বারান্দার ওধার হইতে নরনারীর মিলিত কণ্ঠের উল্লাস শুনা যাইতেছে।

যাহার নাম সুহাসিনী, সে কহিল, আমাদের এবার ঘুম পেয়েছে, আপনি বাড়ী যান্ প্রিয়বাবু। বলি, শুন্‌চেন ?

উঁহু, শুন্‌চিনে।

দ্বিতীয়া কহিল, তা শুন্‌বেন কেন। বড়লোক মানুষ, ক্ষিধে ত আর পায় না, আমরা কিন্তু এবার খেতে যাবো।

বেশ, খেয়েই এসো।—বলিয়া যুবকটি নিশ্চল হইয়া পড়িয়া রহিল।

ভিজে বেড়ালটি! খেয়ে এসে আর কথা কইব না কিন্তু। ছাদে গিয়ে ঘুমোবো। সারাদিন হৈ চৈ হোলো, এবার যান না কেন ?

হ্যাঁ, এই যাই।—প্রিয়বাবু চোখ বুজিয়া কহিল,

আচ্ছা, আর একটু বসি। নেশাটা কমুক্। ততক্ষণ কথা কইবার জন্যে আর একজনকে দিয়ে যাও, কেমন ?

আবার একজনকে ? সর্ব্বনাশ, পালে বাঘ পড়েছে ! কা'কে দেবো ? সুনীতি আসবে না, ওর দাম বেশি।

দাম বেশী ? কেন ? অহঙ্কার আছে নাকি খুব ?

তা একটু আছে। তা ছাড়া—রূপ ! নতুন এসেছে, টাকা বেশী চাইবে না ? একটা কথার দামই দশটাকা।

ওরে বাবা! বেটি পূর্ব্বজন্মে ডাক্তার ছিল বোধ হয়। ডাকো না একবার, চেহারাখানা দর্শন করেই যাই।

সুহাসিনী তাহাকে ডাকিতে উঠিয়া গেল। দ্বিতীয়ার নাম সুনীলা। সে কহিল, আবার কবে আসবেন ? গরীবদের মনে রাখবেন ত ?

প্রিয়বাবু হাসিয়া জড়িতকণ্ঠে কহিল, নিশ্চয়ই, তোমরাই ত আমার মন জুড়ে থাকো। কাল ভোর বেলায়ই আসব, রোজ আসব। মোটর আছে, টাকা আছে, প্রাণে বিরহ আছে, ভাবনা কি ?

সুনীলা কহিল, ভোরবেলা কেউ আসে এদিকে ?

নিশ্চয়ই আসে। দিনের আলোয় আসা উচিত,

চোখ থাকে পরিষ্কার। যারা রাত্তিরে আসে, তারা পাজি লোক, তারা বাঁদর।

আপনার বাড়ীতে কে কে আছেন ?

প্রিয়নাথ উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিল। হাসিয়া বলিল, কে কে আছে ? তোমার গলার আওয়াজটি ভারি মিষ্টি !

এমন সময় সুহাসিনী সুনীতিকে লইয়া আসিয়া দাঁড়াইল। কহিল, এই দেখুন !

প্রিয়বাবু দেখিল। কহিল, মেঘের মতন মুখ। কি গো, লোকে বলছে তোমার নাকি অহঙ্কার খুব। সত্যি ?

সুনীতি কহিল, হ্যাঁ, সত্যি, কি বলছেন বলুন।

বলছি যে তোমার নাকি দাম অনেক ?

সুহাসিনী তাহার হইয়া জবাব দিল,—অত কথা কেন গা ? ও' দশটাকা নেবে। আপনি রাজি আছেন ?

নিশ্চয়ই রাজি। মাত্র দশ টাকা ! সামান্য। নতুন এসেছে, নেবে বৈকি। অত রূপ, মোটে দশ টাকা ? পনেরো টাকা চাইল না ?

সুহাসিনী ও সুনীলা উঠিয়া গেল। যাইবার সময়

বলিল, তবে ও' রইল, যেন শেষকালে আর গোলমাল করবেন না। আমরা খেয়ে আসি। সুনীতি, তোর ঘরে ওঁকে নিয়ে যা'না ভাই?

তাহারা চলিয়া গেলে সুনীতি প্রিয়বাবুকে নিজের ঘরে লইয়া গেল। এ ঘরটিও তাই। একটি ঘর আরেকটির অনুকরণ। সেই আলো, সেই পাখা, সেই মেঝের উপর অয়েলক্লথ-পাতা বিছানা, পাশে নূতন গদিযুক্ত খাট, আলমারিতে কাঁচের পুতুল, র্যাকের উপর কাঁচের গেলাসের সারি। দর বেশী বাড়াইবার জন্য আসবাবপত্রের আভিজাত্য এবং আতিশয্য। দেয়ালের গায়ে রাধাকৃষ্ণের নাম করিয়া কতকগুলি দুর্নীতিমূলক চিত্র টাঙানো।

প্রিয়বাবু কহিল, তোমার তেজ আছে, কিন্তু তুমি শান্ত। কই, বসলে না কাছে?

সুনীতি তবু দাঁড়াইয়া রহিল। প্রিয় কহিল, তুমি কি সকলের কাছেই টাকা বেশী নাও?

সুনীতি কহিল, যারা মদ খেয়ে আসে তাদের কাছে আরো বেশী নিই।

কথাগুলি প্রিয়নাথের কানে কর্কশ ঠেকিল, কিন্তু ভালোও লাগিল। জিজ্ঞাসা করিল, কেন?

মাসিমা ব'লে দিয়েছেন।

প্রিয়নাথ কহিল, সব নতুন। মদ খাওয়াও নতুন, এদিকে আসাও নতুন। মদ আমি বেশী খেতে পারিনে, বমি আসে। আচ্ছা, তোমার দেশ ছিল কোথায়?

চুলোয়।

প্রিয়নাথ হাসিল। কহিল, তুমি ভারি রাগী, নয়? ছাখো, আমি নতুন, তাই তোমাদের ওপর এখনো মায়াদয়া আছে। রাগ ক'রো না।—বলিয়া সে চুপ করিল। যাহার ঘরে আসিয়াছে তাহাকে কাছে আনিবার কোনও লক্ষণই তাহার প্রকাশ পাইল না।

কিন্তু এ পাড়ায় কোনও পুরুষকে সংহত আচরণ করিতে দেখিলে মেয়েরা চিন্তিত হইয়া উঠে।

সুনীতি একসময় প্রশ্ন করিল, পান সেজে দেবো?

না। বলিয়া প্রিয়নাথ আবার মুখ তুলিল। কহিল, ওসব নেশা আমার নেই। ওগুলো সস্তা দৌরাত্মি। আচ্ছা, তোমাদের সকলের নামের আগে 'সু' কেন বলো ত?

এখানকার নিয়ম।

এখানেও আবার নিয়ম আছে বুঝি? বেশ। আর কি বল্‌ব, কথা খুঁজে পাইনে। কই, তোমার

মুখ ত এদের মতন নয়। দাগও নেই, ছাপও নেই! কতদিন এসেছ বল্‌বে?

শুনে আপনার লাভ?

প্রিয়নাথ চুপ করিয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ পরে বলিল, লাভ-লোকসান ত কিছু নেই, শুধু আলাপ করা। তুমি বললেই কি আর মনে থাকৃত, পথে বেরিয়েই ভুলে যেতুম। আচ্ছা, একটা কাজ করলে হয় না? হ্যাঁ, আমি সত্যিই বল্‌ব, তোমার কথার জন্যেই তোমাকে ভালো লেগেছে। একটা কথা রাখবে? নীচে আমার মোটর দাঁড়িয়ে, যদি একটু বেড়িয়ে আসি, ধরো তা হ'লে—

বেড়াতে গেলে বেশী টাকা দিতে হবে কিন্তু।

কত?

পঁচিশ টাকা। পঁচিশ টাকার কম আমি যাইনে।

প্রিয়নাথ পকেটে হাত ঢুকাইয়া টাকা বাহির করিল। তিনখানা নোট ফেলিয়া দিয়া হাসিয়া কহিল, পাঁচ টাকা আরো নাও, কিন্তু তুমি খুসি থাকো। টাকাই দেখ্‌ছি তোমাদের কাছে বড়! বেশ।

টাকার চেয়ে বড় আর কি আছে বলুন। বসুন তবে একটু! খেয়ে আসি। আমাকে কিন্তু ঘণ্টা দুয়েকের

মধ্যেই ফেরৎ দিয়ে যাবেন। বলিয়া টাকা লইয়া খুশি হইয়া সুনীতি চলিয়া গেল।

সুহাসিনী ও সুনীলার নিকট বিদায় লইয়া সুনীতির সহিত প্রিয়নাথ মোটরে উঠিয়া যখন ড্রাইভারকে গাড়ী চালাইতে বলিল, রাত তখন দশটা বাজিয়াছে। সরু পথ পার হইয়া বড় রাস্তায় পড়িয়া প্রিয়নাথ কহিল, তোমাকে যে আসতে দিলে ওরা? আপত্তি করলে না? শুনেছি মাসীরা মেয়েদের আট্‌কেই ত রাখে?

সুনীতি কহিল, আমাকে আট্‌কায় না! নিজের ইচ্ছেয় এপথে এসেছিলুম কিনা তাই ওরা বিশ্বাস করে। জানে, ঠিক ফিরে আসব!

প্রিয়নাথ কহিল, নিজের ইচ্ছেয় এসেছিলে? এ পথে নামতে তোমার ভালো লাগল?

ভালো আর মন্দ! এই ত পথ আমাদের।

এই পথ? এই গণিকাবৃত্তি, এই নোংরামি, এই অভিশপ্ত জীবন—

সুনীতি তাহার মুখের দিকে একবার তাকাইল, পরে কহিল, মদ আনেননি সঙ্গে? খাবেন কি তবে?

খাবো না মদ। প্রিয়নাথ কহিল, ও ছাই আমার

ভালো লাগে না, বড় তেতো। তা ছাড়া খেলো ফুর্ত্তি করার ধাত আমার নয়। যারা মাতাল, যারা বেশ্যা-সক্ত আমি তাদের অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করি।

এত জানেন তবে এলেন কেন?

বাঃ তোমার গলার আওয়াজটি ভারি মিষ্টি। হ্যাঁ, এসেছিলুম অভিজ্ঞতার জন্যে। তোমাদের জগতের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল না। কিন্তু তোমাকে পেয়ে বেশ লাভ হোলো মনে হচ্ছে।

সুনীতি হাসিতেছিল তাহা প্রিয়নাথ দেখিতে পাইল না। সে বলিতে লাগিল, লাভ বৈ কি। তোমার মুখ-চোখের ভদ্র ভাবটাই আমার বড় লাভ। কই, তোমার আসল নামটা ত বললে না?

আসল নাম নিয়ে আপনার কি হবে? আমি ত রইছি আপনার কাছে।

প্রিয়নাথ কহিল, আমার বাড়ীতে যাবে?

বাড়ীতে? বাড়ীতে কেমন ক'রে নিয়ে যাবেন?

কেউ নেই সেখানে, আমি একা। গেলে নিতান্ত খারাপ লাগবে না।

সুনীতির গায়ে কিছু সোনার গহনা ছিল। এই ভদ্রবেশধারী লোকটার কথায় ভয় পাইয়া আমৃতা

আম্‌তা করিয়া কহিল, ওদের ব'লে এলুম না...তা ছাড়া এত রাতে—

সে তোমার ইচ্ছে, আমি জোর করব না।

কখন্ ফিরব?

ধরো যদি কাল কোনো সময়ে ফিরে এসো? ওরা কি ভাববে, খুব! মাসি রাগ করবে?

সুনীতি কহিল, টাকা বেশি চাইবে।

আচ্ছা তাই দেবো। চলো যাওয়াই যাক্।

মাঠের ভিতর দিয়া মোটর চলিতেছিল, প্রিয়নাথ খুসি হইয়া ড্রাইভারকে বাড়ীর দিকে যাইবার ইঙ্গিত করিল। কোথায় যে কেমন করিয়া কোন্ মুহূর্ত্তে কাহাকে ভালো লাগে তাহা বুঝিবার উপায় নাই। প্রিয়নাথের নেশা কোন্ সময়ে যে কাটিয়া গিয়াছে তাহা সে নিজেই ভুলিয়া গেছে। কোনও পতিতা স্ত্রীলোককে ভদ্রভাষিণী এবং রুচিসম্পন্না মনে হইলে যে ভদ্রসন্তানেরা মোহগ্রস্থ হইয়া পড়ে প্রিয়নাথ তাহাদেরই একজন।

সুনীতির এসব ভালো লাগিতেছিল না, পাশে বসিয়া বিশ্রী অস্বস্তি বোধ করিতেছিল। লোকটা কথা কহিতেই ভালবাসে, কথা দিয়া কথার প্যাঁচ বাহির

করে, কথা-ব্যবসায়ী। কথা কহিয়া নিজের মনের নিরুপায় দৈন্যকে কেবলই ঢাকিতে চেষ্টা করে। এমন লোক যে নিরাপদ নয় তাহা মাসিমার নিকট সে অনেক-বার শুনিয়াছে। ইহারা গিলিয়া খায় না, মিষ্টকথার ছুরি দিয়া একটু একটু করিয়া কাটিয়া চিবাইতে থাকে।

পাশে বসিয়া প্রিয়নাথ তাহার সঙ্গিনীকে অনুভব করিতেছিল। ইহার ভিতরে রূঢ়তা আছে বলিলে ভুল হইবে, কিন্তু যাহা আছে তাহাকে একটি রুক্ষ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বলা চলে। একসময়ে সে কহিল, তুমি কিন্তু এতক্ষণেও আমাকে বিশ্বাস করতে পারলে না।

কেন ?

নামটা পর্য্যন্ত তুমি চেপে রাখলে।

বিরক্ত হইয়া সুনীতি কহিল, বার বার আপনার এক কথা। আমার নাম সত্যবালা, শুন্‌লেন ত' ?

প্রিয়নাথ আর কথা বলিতে সাহস করিল না।

রাত্রির রহস্যের ভিতর দিয়া কিছুই বুঝা যাইতেছিল না, কেবল দেখা গেল শহরের প্রান্তসীমা পার হইয়া মোটর আসিয়া একটা অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ পথে ঢুকিয়াছে। সরকারি এক আধটা আলো আকাশের জ্যোৎস্নায় আপন

আপন ঔজ্জ্বল্য হারাইয়া এখানে ওখানে টিম্ টিম্ করিতেছিল। চারিদিক নিদ্রিত, নিস্তব্ধ।

গাছপালা-ছাওয়া একটা পথের ভিতর ঢুকিয়া মোটর এক জায়গায় আসিয়া থামিল। কিন্তু মোটরের হর্ণ শুনিয়া কোথা হইতে যে প্রেতের মতো প্রহরী আসিয়া তৎক্ষণাৎ সেলাম করিয়া দাঁড়াইল তাহা এক বিচিত্র ঘটনার মতো সত্যবালার চোখে ঠেকিল। ভয়ে তাহার গা কাঁপিতেছে,—গায়ে তাহার এতগুলি অলঙ্কার, সে যে কেমন করিয়া পুনরায় মাসির আশ্রয়ে ফিরিয়া যাইবে তাহাই ভাবিয়া তাহার মন আকুল হইয়া উঠিল। সংসারে এই মাসির মতো নিরাপদ আশ্রয় আর তাহার কোথাও নাই।

দুইজনেই মোটর হইতে নামিল। যতদূর দেখা যায় অস্পষ্ট স্নিগ্ধ রৌদ্রের মতো জ্যোৎস্না চারিদিক প্লাবিত করিয়াছে। দক্ষিণের সুন্দর বাতাসে সেই চন্দ্রালোক এক একবার দুলিয়া উঠিতেছিল। প্রিয়নাথ কহিল, এই ছাখো সত্যবালা, এটা আমার সখের বাগান! লাল ফুল ছাড়া এ বাগানে অন্য ফুল ফোটাবার আইন নেই। বলিয়া সে হাসিল।

টাকা লইয়াছে, মোটরে চড়িয়া বাগানবাড়ীতে

বেড়াইতে আসিয়াছে সুতরাং তারিফ করিতেই হইবে। সত্যবালা শুষ্ক হাসিয়া কহিল, তাই নাকি, এ ত' বেশ!

মোটর চলিয়া গেল। পিছনে দারোয়ান করজোড়ে দাঁড়াইয়া। চাকর দুইজন দরজার কাছে দাঁড়াইয়া হুকুমের অপেক্ষা করিতেছে। প্রিয়নাথ কহিল, এসো ওপরে যাই! ওরে, আলোগুলো জ্বাল্ ত'।

যে আজ্ঞে।

বাড়ীর অন্দরে ও বাহিরে এক একটি করিয়া অনেকগুলি আলো জ্বলিয়া উঠিল। সম্মুখে প্রকাণ্ড দালান পার হইয়া দুইজনে ভিতরে ঢুকিল। সত্যবালা এদিক ওদিক তাকাইয়া দেখিল, এই সুবৃহৎ অট্টালিকার কোথাও পরিবার-পরিজনের চিহ্ন মাত্র নাই। চারিদিকে প্রচুর আসবাবপত্র ও সম্পদ্-সজ্জা, কিন্তু সবই অবিন্যস্ত, বিশৃঙ্খল, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। চাকর-দারোয়ান ছাড়া একজন দ্বিতীয় কাহাকেও দেখিবার জন্য সে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। কলিকাতার এত নিকটে যে এমন [illegible]পুরী থাকিতে পারে ইহা তাহার ধারণাতেও ছিল না।

হ্যাঁরে কুঞ্জ, আজ কেউ এসেছে?—প্রিয়নাথ কহিল।

কুঞ্জ কহিল, আজ্ঞে হ্যাঁ, অনেকেই, আছেন তাঁরা বাইরের ঘরে।

হঠাৎ ক্রুদ্ধকণ্ঠে সত্যবালা কহিল, এবার না ব'লে আর থাকতে পারলুম না, আপনার আগেই বলা উচিৎ ছিল প্রিয়নাথবাবু—

তাহার গলার আওয়াজে লজ্জিত হইয়া প্রিয়নাথ কুঞ্জকে চলিয়া যাইতে বলিল, তারপর স্নিগ্ধ হাসিয়া কহিল, চাকরের সামনে কি অমন গলায় কথা কয়? আমার যে অপমান!

সত্যবালা কহিল, না, রাগের কথা নয়, আমাদের মানুষের শরীর, আপনার এত লোকের হল্লা আমি সইতে পারব না। এক্ষুণি আমাকে দিয়ে আসুন। আপনার টাকা আমি গিয়ে ফিরিয়ে দেবো।

কা'দের কথা বলচ সত্যবালা?

ওইত, যারা বাইরের ঘরে রয়েছে!

প্রিয়নাথ আবার হাসিল। বলিল, ওরা? ওরা যে চাঁদা চাইতে এসেছে। ওরা আমার অনুগ্রহপ্রার্থী, নিচের তলাকার লোক। কেউ এসেছে স্বার্থে, কেউ এসেছে শোষণ করতে, কেউ বা এসেছে হিতোপদেশ দিয়ে কাজ হাসিল করতে। ওরা কেউ নয়।

সত্যবালা চুপ করিয়া গেল।

একটি সুসজ্জিত ঘরে আনিয়া প্রিয়নাথ তাহাকে

বসাইল। এত যত্ন, এত আগ্রহ, কিন্তু ভিতরে ভিতরে সে যেন নিস্পৃহ, টানাটানি করিয়া কাড়িয়া কিছু লইবার চেষ্টা তাহার দেখা যাইতেছে না। বাস্তবিক, এইজন্যই তাহাকে ভয় করে। সত্যবালার মনে হইল, এ সমস্তই একটা গভীর ষড়যন্ত্র, লোকটা সম্ভবতঃ প্রকাণ্ড এক প্রবঞ্চকদলের নায়ক, স্ত্রীলোককে ঐশ্বর্য্যের মোহে ভুলাইয়া ভীষণ একটা কিছু কাজ হাসিল করিতে চায়। গহনাগুলি ত যাইবেই, প্রাণ লইয়া এখন ফিরিতে পারিলে হয়।

এবার তোমার রাগ পড়েছে? কথা বল্‌ব?

সত্যবালা কহিল, রাগ ক'রে কি কর্‌ছি বলুন। আপনার সঙ্গে ত আগে দেনা-পাওনা ছিল না তাই ভয় হচ্ছিল।

ভয় কিছু নেই, তুমি নিঃসঙ্কোচে থাকো, এখানে তোমার কোনো বিঘ্নই ঘট্‌বে না।—প্রিয়নাথ বলিতে লাগিল, আজ এই ঘরটায় থাকবে? তাই থাকো! এটা আমার শোবার ঘর। যদি ইচ্ছে হয়, আলোটা জ্বালিয়েও রাখতে পারো।

অনেক কলা-কৌশল করিয়াই তাহার বিশ্বাস উদ্রেক করা হইতেছে। বিশ্বাস তাহার কিছুতেই নাই।

স্ত্রীলোক আনিয়া এই লোকটা বোধ হয় এমন করিয়াই জুয়া খেলে। যে বাড়ীতে পুরনারী এবং শিশুসন্তান নাই সে-বাড়ী যে কেবলমাত্র মমতাশূন্য ও দাক্ষিণ্যহীন তাহাই নয়, সেস্থান সংশয় ও বিপদের বাসা, তাহার সম্বন্ধে সতর্ক থাকা দরকার। নিঃসঙ্কোচে থাকিবে সে? মৃত্যুর পরে সে কেবল নির্বিঘ্ন ও নিঃসঙ্কোচ হইতে পারিবে, তাহার আগে নয়।

যাই দেখি যদি কিছু জোটে, সারাদিন আজ উপবাস চলছে। বলিয়া প্রিয়নাথ উঠিল।

সত্যবালা কহিল, আপনার এখানে কাউকে দেখচিনে কেন?

কা'কে দেখবে বলো?

আপনার বিয়ে হয়নি?

হয়নি নয়, করিনি। মা-বাপ? তাঁরা স্বর্গে। দুটি মাত্র ভাই আমরা—ব্যস। দাদা থাকেন বালিগঞ্জে, তাঁর অবস্থা আমার চেয়ে অনেক ভালো।

আপনার অবস্থাই বা কি মন্দ?

হ্যাঁ, মন্দ নয়, আরো ভালো হোতো যদি আই-সি-এস্ পরীক্ষায় পাস হতুম। কিন্তু হাকিমী করার চেয়ে বাপের সম্পত্তি ওড়ানোয় আমোদ আছে। কি বলো?

সত্যবালা একটু হাসিল মাত্র। কত অদ্ভুত চরিত্রই এই অল্পদিনে তাহার সংস্পর্শে আসিল। পুরুষ মানুষ বিচিত্র জীব। ইহার কথাবার্ত্তাগুলা যেমন সুলভ তেমনি চটকদার, এমন বাকপটুতা সে অনেক দেখিয়াছে। সংসারী লোক না হইলে কথাবার্ত্তায় মাত্রাজ্ঞান থাকে না। অসৎ চরিত্রের সহিত অহঙ্কার মিশিয়া লোকটা পীড়াদায়ক হইয়া উঠিয়াছে।

আচ্ছা, আমি এবার যাই, রাত অনেক হয়েছে। বলিয়া প্রিয়নাথ বাহির হইয়া গেল।

অনেকক্ষণ একই জায়গায় বসিয়া বসিয়া সত্যবালার ক্লান্তি আসিল। আজ সন্ধ্যায় দুইটা লোক ঘণ্টা দুই ধরিয়া তাহার ঘরে উৎপাত করিয়া গেছে, তা ছাড়া সমস্ত দিনের পরিশ্রম—তাহার চোখ দুইটা ঘুমে জড়াইয়া আসিতে-ছিল। এখানে না আসিয়া ঘুমাইলেই ভালো হইত।

অপেক্ষা করিতে আর তাহার ধৈর্য্য রহিল না, উঠিয়া সে বাহিরে আসিল। দালানের কোলেই ছোট একটা ছাদ, তাহারই পাঁচিলে টবের চারা হইতে বেল ফুলের মিষ্ট গন্ধ প্রথমেই সে অনুভব করিল। চোখ পড়িতেই দেখিল, পাঁচিলের এক কোনে কে যেন ছায়ামূর্ত্তির মতো নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া আছে।

তাহার পায়ের শব্দ পাইয়া প্রিয়নাথ কথা কহিয়া উঠিল,—একি, তুমি এখনো শোওনি সত্যবালা ?

সত্যবালা কহিল, আপনি আসবেন না ?

কোথায় ? বলিয়া প্রিয়নাথ নিকটে সরিয়া আসিল।

কেন, আপনার ঘরে ?

তাহার একটি হাত ধরিয়া প্রিয়নাথ তাহাকে ঘরের কাছে আনিল। হাসিয়া কহিল, না, আজ থাক্। চাঁদের আলোয় একটু দাঁড়িয়ে ছিলুম, বেশ লাগছিল।

সে কি কথা, এত কাণ্ড ক'রে আনলেন, এত টাকা খরচ হলো, অথচ—

এনেছি, সেই ত আনন্দ! যাও, শোওগে। দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ ক'রে দাও।

অপ্রত্যাশিত সৌজন্যে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া সত্যবালা ভিতরে ঢুকিলে নিজেই সে দরজাটা ভেজাইয়া দিয়া চলিয়া গেল। অলস ও অসাড় হস্তে সত্যবালা ধীরে ধীরে ভিতর হইতে দরজায় খিল তুলিয়া দিল। লোকটার নিকট কোথায় সে যেন পরাজিত হইতেছিল।

সকাল বেলা উঠিতে তাহার দেরী হইল। তাহার যে জীবনযাত্রা তাহাতে মধ্যাহ্নের খররৌদ্র পর্য্যন্ত

ঘুমাইলেও ডাকিয়া তুলিবার কেহ নাই। উঠিয়া সে জানালার ধারে আসিয়া দাঁড়াইল। গ্রীষ্মকালের সকাল, ইহারই মধ্যে চারিদিক উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। গত রাত্রে সে বুঝিতে পারে নাই, আজ চাহিয়া দেখিল, সম্মুখে বৃক্ষলতাময় মাঠ, তাহারই প্রান্তপথে এক আধটি স্ত্রী-পুরুষকে চলিয়া যাইতে দেখা যাইতেছে। তাহার জানালার নীচে বাগান, সেখানে একজন তখন গাছের গোড়ায় গোড়ায় জল ছিটাইতেছিল।

কিন্তু আর বেলা করিয়া লাভ নাই, এখনই তাহাকে যাইতে হইবে, মাসি ভাবিতেছে, মেয়েরা হয় ত জটলা পাকাইতেছে—তা ছাড়া বাড়ীওয়ালার টাকা আজ পরিশোধ করিতে হইবে, দুপুর বেলা সেই মাড়োয়ারী বেটা আসিবে বলিয়া গিয়াছে,—আজ সে ভীষণ ব্যস্ত। সকলকে সমান ভাবে খুশি না রাখিতে পারিলে তাহার চলিবে কেমন করিয়া? সত্যবালা দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিল।

বাহিরে আসিয়া দেখিল, অদূরে একটি গেঞ্জি গায়ে প্রিয়নাথ একখানা কার্পেটের উপর বসিয়া নানারকম কাগজপত্র লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছিল। দেখা গেল ইহারই মধ্যে তাহার স্নান হইয়া গিয়াছে।

সত্যবালাকে দেখিয়া সে একটু হাসিল, কহিল, সুপ্রভাত!

সত্যবালা কহিল, আমি এখনই যাবো ত?

এখনই? স্নান না ক'রেই? সে হবে না। ওরে কুঞ্জ, বাথ্‌রুমটা দেখিয়ে দে।

কুঞ্জ তাহার আগে আগে গিয়া সবিনয়ে সমস্ত দেখাইয়া দিয়া আসিল। প্রিয়নাথ ততক্ষণ দ্রুতবেগে নিজের কাজ কর্ম্ম সারিয়া লইতেছিল।

আধঘণ্টা বাদে বাথরুম্ হইতে বাহির হইয়া সত্যবালা সবিস্ময়ে দেখিল, নূতন একখানা সাড়ী লইয়া কুঞ্জ দাঁড়াইয়া আছে। কহিল, এই নিন্ মা, ওসব থাক্, আমি কেচে দেবো।

কাপড় লইয়া সিক্তবস্ত্রে সত্যবালা দালানে আসিয়া দাঁড়াইল, তাহার দেহের বিচ্ছুরিত লাবণ্য ও রূপের দিকে যে প্রিয়নাথ একবার মুগ্ধদৃষ্টিতে তাকাইল তাহাতে সে কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ করিল না।

ঘরে আসিয়া সত্যবালা দেখিল, মেঝের উপর শীতল পাটি পাতা, তাহার কাছে একখানা আসনের সম্মুখে ফল, মিষ্টান্ন থরে থরে সাজানো, তাহার পাশে রূপার রেকাবে পাণ। কাপড়খানা সে ছাড়িল বটে

কিন্তু তারপর অপলক চোখে সে একদিকে তাকাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। পা দুইটা তাহার একটু একটু কাঁপিতেছিল। কেন, তাহার অন্তর তাহা স্পষ্ট জানে। মানুষের ভিতরে পশু ও পাপকে দেখিয়া দেখিয়া সে অভ্যস্ত, দেবত্বের চিহ্ন কোথাও চোখে পড়িলে দুর্ভাবনা ও আশঙ্কায় সে বিচলিত হইয়া উঠে।

প্রিয়নাথ দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। সবিনয়ে কহিল, সামান্য জলখাবার, হয়ত তোমার মনের মতন হয়নি। যাবার কি খুব তাড়া আছে সত্যবালা?

সত্যবালা কহিল, তারা সবাই ভাবছে।

প্রিয়নাথ হাসিয়া কহিল, হয় ত ভাবছে তাদের সুনীতিকে একটা দুশ্চরিত্র লোক জাহান্নমের দিকে নিয়ে গেছে। যাই বলো সত্যবালা, ওদের ভেতর গিয়ে দাঁড়ালে আমার বমি আসে। তুমি কেমন ক'রে সহ্য করো বলো ত?

আমি ত ওদেরই একজন!

প্রিয়নাথের উৎসাহ নিবিয়া গেল। কিছুক্ষণ মাথা হেঁট করিয়া থাকিয়া একসময় মুখ তুলিয়া কহিল, যদি আর একটু থাকো তাহলে আমি এখনই একটা খবর

পাঠিয়ে দিতে পারি। অবশ্য তোমার লোকসান করব না, আজকের জন্যও তোমার টাকা পুরিয়ে দেবো।

বেশ, তাই খবর পাঠান।

প্রিয়নাথ নাচিতে নাচিতে চলিয়া গেল। মিনিট পাঁচেক পরে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, মোটর পাঠাচ্ছি, তুমি কিছু ব'লে দেবে ড্রাইভারকে?

কাগজ কলম পেলে একটা চিঠি লিখে দিতুম মাসিকে।

কুঞ্জ ছুটিয়া গিয়া লিখিবার সরঞ্জাম আনিল।

চিঠি লইয়া ড্রাইভার সেলাম জানাইয়া চলিয়া গেলে প্রিয়নাথ একগোছা নোট সত্যবালার নিকটে রাখিল। সত্যবালা সেদিকে একবার তাকাইল বটে কিন্তু তুলিয়া লইল না। টাকাটা যেন তাহাকে পীড়া দিতেছে।

কাল থেকে আমার একটা ভারি সাধ হয়েছে, তোমাকে বল্‌ব সত্যবালা?—প্রিয়নাথ কহিল।

আঃ এইবার হয় ত লোকটা মুখোস খুলিয়া ফেলিবে। হঠাৎ সত্যবালা খুশি হইয়া কহিল, বলুন, শুন্‌ব বৈ কি।

দুটি ভাত আজ তোমাকে খেতে হবে। আমার অনুরোধ, কথাটা তুমি রাখো, লক্ষীটি।

সত্যবালা প্রথমটা অবাক হইয়া তাহার মুখের দিকে

চাহিল। তারপর সে মুখ নিচু করিয়া কহিল, আপনার এত টাকা নিচ্ছি, আর ভাত দুটি খাবো না? খাবো। মাসিকে লিখে দিয়েছি আমার যাওয়া পর্য্যন্ত যেন না ভাবে।

প্রিয়নাথ খুসিমুখে বাহির হইয়া গেল। যেন কতকালের কাঙাল, যেন কত দীন! দুর্নীতি লইয়া যাহার খেলা, তাহার অভিনয় এমনি অকৃত্রিম হওয়া প্রয়োজন। সত্যবালার মনে হইল লোকটা ছলনা করিতে সিদ্ধহস্ত। সোনার হরিণ দেখাইয়া তাহাকে ধীরে ধীরে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। কতদূর যে তাহাকে যাইতে হইবে তাহার কোনই স্থিরতা নাই। কখন্ যে ইহার কবল হইতে ছাড়া পাইবে তাহাও অজ্ঞাত। এক একটা লোক এমনি এক এক জন পতিতার জীবনে কোথা হইতে ছিটকাইয়া আসে, দিনকতক অন্ধের মতো লুটোপুটি খায়, কিছু হৃদয়ের সুর লইয়া কাঁদাকাটা করে, তারপর একদা কোথায় আবার ভাসিয়া পালায়। পথবাসিনী পতিতা দিনের পর দিন হয় ত আনমনে তাহার আগমন প্রতীক্ষা করে, দুই চারিটা করুণ চিহ্ন লইয়া নিভৃতে হয় ত একবিন্দু অশ্রুপ্রাত করে, তারপর তাহাকেও ভুলিয়া যাইতে হয়।

আবার আসে উদরান্ন-সংস্থানের আহ্বান। এই তাহাদের জীবন!

সকলের চেয়ে বিপদ এই যে, এই লোকটাকে একটু ভালো বলিয়া তাহার সন্দেহ হইতেছে। ভালো বলিয়াই সে উদ্বিগ্ন, মন্দ হইলে সে নিশ্চিন্ত হইতে পারিত। ইহার হাসি, ভঙ্গী, আলাপ—সমস্তটাতেই সংশয় উদ্রেক করে! কাছে আসে না, দূরে দূরে বেড়ায়। ইহার ভিতরে পশুত্বের অভাব দেখিয়া সে গত রাত্রি হইতে নিরন্তর বিস্ময় বোধ করিতেছে। ভয়ানক হিংস্র জানোয়ার বলিয়াই হয় ত ইহার প্রকৃতি এইরূপ। শিকারকে মুখের কাছে বন্দী রাখিয়া উগ্র আনন্দে এ যেন ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, দেবত্বের মুখোস-পরা এত বড় দানব ইহার আগে সত্যবালার কখনও চোখে পড়ে নাই! ইহার বিচিত্র অনাসক্তি ও বৈরাগ্য দেখিয়া তাহার ভয় করিতে লাগিল।

প্রিয়নাথ আবার ফিরিয়া আসিল। হাসিয়া কহিল, রান্নার কথা ব'লে দিলুম। রাত জেগেছ, মাছ-মাংস খেয়ো না, কেমন? আঃ বাড়ীটা আজ আমার হাসছে, মেয়েরা হচ্ছে ঘরের-লক্ষ্মী।

সত্যবালা কহিল, লক্ষ্মী একটি আনলেই ত পারেন।

এনেছি ত লক্ষ্মী, এবার তাঁর সেবা করব। তুমি গো তুমি, তোমার চোখে মুখে আমার চিরকালের কল্পনা ভেসে উঠছে।—বলিয়া প্রিয়নাথ ছেলেমানুষের মতো হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

সুলভ তোষামোদ, এইবার সম্ভবতঃ রং চড়াইয়া সে ভালোবাসার কথা বলিবে। ভালোবাসা জানানোর পরম লক্ষ্যটা সবাই জানে। কিন্তু টাকা দিয়াছে যে, সে ছলনা করে কেন? অঙ্গুলিহেলন করিলে এখনই ত সত্যবালাকে আহার পায়ের তলায় লুটাইয়া পড়িতে হইবে। কেবলমাত্র বিনিময়-মূল্যের প্রশ্ন!

হাসি থামিলে প্রিয়নাথ কহিল, ছাখো, মাঝে মাঝে আমার এসব কিছু ভালো লাগে না।

কোন্ সব?

এই ছাই বিষয়-সম্পত্তি, কাজকর্ম্ম, সামাজিকতা—

তখন্ বুঝি যান্ ওপাড়ায় মদ খেতে?

প্রিয়নাথ আবার হাসিল। কহিল, সত্যি বল্‌ব? মদও আমি খাইনে, ওপাড়াতেও যাইনে! যা করি তা শুন্‌লে তুমি হাসবে, ভদ্র ভাষায় তাকে বলে দেশের কাজ। যাক্ সে কথা। কিন্তু মাঝে মাঝে আর স্থির থাকতে পারিনে, যেখানে সেখানে বেড়িয়ে পড়ি।

সত্যবালা, আমার একটা ভীষণ দুর্ব্বলতা আছে, জানো ?

সত্যবালা তাহার মুখের দিকে চাহিল।

বছর দশেক আগে, বুঝলে, আমার বয়স তখন এই ধরো একুশ বাইশ, একটি মেয়েকে ভালোবেসেছিলুম, অনেকটা সে,—রাগ ক'রো না, দেখতে তোমারই মতন,—হঠাৎ সত্যবালার মুখের দিকে চাহিয়া প্রিয়নাথ হা হা করিয়া পুনরায় হাসিয়া উঠিল, বিশ্বাস হয় না, নয় ? বয়সটা আমার সত্যিই এত বেশি হয়েছে যে প্রেমের গল্প বলতে গেলেও লজ্জা করে···কী ছেলে-মানুষি কাণ্ড !

তিনি কোথায় এখন ?

হাতের বুড়ো আঙুলে কলা দেখাইয়া প্রিয়নাথ কহিল, কোথাও থাকলে আর ভাবনা কি ! মরজগতে তিনি আপাততঃ অনুপস্থিত !

নেই ? মারা গেছেন ?

হ্যাঁ, এই নিজের হাতেই, বুঝলে, তাঁর সোনার অঙ্গে অগ্নিসংযোগ ! বিরহে কেটে গেল এতকাল ! আই-সি-এস পরীক্ষা দেবার দিনেও বিলেতে ব'সে সেই গানটা গেয়েছিলুম—'দিয়েছি সে স্বর্ণলতায় আপন

হাতে চিতায় তুলে'! এমন আজগুবি প্রেম আমি আর দেখিনি, চিরকাল আমাকে কঠোর ব্রহ্মচর্য্য পালন করালে! হা হা হা—আবার প্রিয়নাথ হাসিতে লাগিল।

এমন সময় দরজার বাহিরে দারোয়ান সাড়া দিয়া ডাকিল, বাবুজি?

হাঁ। বলিয়া প্রিয়নাথ বাহিরে আসিল।

সরকার বাবু ভেজ দিয়া। বলিয়া দারোয়ান ছোট একটা মখ্‌মলের কৌটা প্রিয়নাথের হাতে দিয়া সেলাম জানাইয়া চলিয়া গেল। প্রিয়নাথ আবার হাসিমুখে ভিতরে আসিয়া সত্যবালার কাছে বসিল। কহিল, একজোড়া দুল্ আনতে দিয়েছিলুম, এ আমি কিন্তু নিজের হাতে পরিয়ে দেবো সত্যবালা।

হীরা-বসানো দুল্ দেখিয়া সত্যবালা কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। এ যেন অত্যন্ত বাড়াবাড়ি, তাহার মনে হইল। কহিল, আপনি এত দিচ্ছেন কিন্তু আমি যে ভিখিরি মানুষ, শোধ দেবো কেমন ক'রে?

তুমি হাসিমুখে ব'সে থাকলেই আমার শোধ হয়ে যাবে। এসো পরিয়ে দিই।—বলিয়া প্রিয়নাথ হাত বাড়াইল।

কানে দুল্ পরিয়া সত্যবালার চেহারাটা যেন ফিরিয়া

গেল। পাণের দাগ তাহার মুখে নাই, আয়ত ছুটি চোখ আজও ভাসা ভাসা, গায়ের রঙ এখনও উজ্জ্বল, মুখের চামড়া এত অনাদরেও আজও মসৃণ। সকলের চেয়ে আশ্চর্য্য, যাহা প্রিয়নাথকে সবচেয়ে মুগ্ধ করিয়াছে,—তাহার মুখে, চোখে, হাতে, পায়ে কোথাও অভিজ্ঞতার চিহ্ন লাগে নাই, কলঙ্কের কালিও পড়ে নাই। অথচ এই শ্রীই বা আর কতদিন,—রাংতার রূপ, আঁচ লাগিতে থাকিলেই দেখিতে দেখিতে বিবর্ণ হইয়া যাইবে। প্রিয়নাথ একটা নিশ্বাস ফেলিল।

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া সত্যবালা হাসিয়া কহিল, অমন ক'রে কি দেখচেন বলুন ত?

প্রিয়নাথ অন্য কথা পাড়িল। কহিল, খেয়ে দেয়ে তুমি ত এখনি চ'লে যাবে?

যাব না? বা রে, হাত-বদল না হ'লে আমাদের চল্‌বে কেন?

ধরো যদি দু' একদিন থেকে যাও? কষ্ট হবে খুব?

কষ্ট হবে না বটে তবে মন কেমন করবে। আর তা ছাড়া মায়া বাড়িয়ে লাভ কি বলুন?

উৎসুক হইয়া প্রিয়নাথ তাহার হাত ধরিয়া কহিল, তোমাকে আমায় ভালো লেগেছে সত্যবালা।

ভালোলাগা ভালোবাসা নয়।

ও দুটো কি আলাদা? এটা আগে ওটা পরে। আমি—আমি হয় ত তোমাকে ভালোবেসে ফেলেচি সত্যবালা।

সত্যবালা এবার পরিচ্ছন্ন করিয়া হাসিল। কহিল, তাই বলুন, কাল থেকে আপনার এই কথাটার জন্যে কেবলি অপেক্ষা কর্‌ছি। এবার বাঁচলুম।

কেন, তুমি বিশ্বাস করলে না?

সত্যবালা আবার হাসিল। কহিল, হায়রে বিশ্বাস! আপনি দুল্ দিলেন, অনেকে প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে চেয়ে অনুরোধ জানায়, আমরা যেন তাদের কথায় বিশ্বাস করি! ব্রহ্মহত্যের পাতক ত আর হতে পারিনে, বিশ্বাস করতেই হয়!

আচ্ছা, আর বল্‌ব না, ক্ষমা করো। তাহলে নিতান্তই তুমি থাকতে চাও না?

কই তা ত' বলিনি? আপনার হুকুম শুনতে এসেছি, যা হুকুম করবেন, তাতেই আমি রাজি। আর প্রেম? হরি হরি, প্রত্যেকদিন বস্তা বস্তা ওটা আমাদের ঘরে জমা হয়। আমার ঘরে ওটার পরিমাণ কিছু বেশি, কারণ, জানেন ত, আমি নতুন,—তবুও অরুচি ধরে গেছে প্রিয়নাথ বাবু।

প্রিয়নাথ কহিল, অর্থাৎ আমি যা খুশি তাই করতে পারি, কিন্তু ভালোবাসার কথা বলতে পারব না, কেমন?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

আর যদি কিচ্ছু না করি, শুধু ভালোবাসি?

তা হ'লে বুঝব আপনি অজ্ঞান, বে-হিসেবী।

প্রিয়নাথ হাসিয়া কহিল, আর যদি কেবলমাত্র তোমাকে বেঁধে রাখি?

সত্যবালার মুখের চেহারা দেখিতে দেখিতে গম্ভীর হইয়া আসিল। উত্তর পাইবার সাহস না করিয়া প্রিয়নাথ উঠিয়া বাহির হইয়া গেল।

আহারাদি শেষ হইল, বিশ্রামও কিছুক্ষণ হইয়া গেল। সত্যবালার যাইবার চেষ্টা থাকিলেও প্রিয়নাথের পৌঁছাইয়া দিবার চেষ্টা দেখা গেল না, গরমের দিনে পাশের ঘরের মেঝেয় শুইয়া নিশ্চিন্তে সে নিদ্রা দিতেছে। সত্যবালা তাহার ঘরে একবার উঁকি দিয়া দেখিল, দেখিয়া বিরক্ত হইয়া সেও এঘরে আসিয়া শীতল পাটির উপর গা এলাইয়া দিল। মাথার উপর পাখা ঘুরিতেছে, দেখিতে দেখিতে তাহারও ঘুম আসিতে বিলম্ব হইল না।

ঘুম ভাঙিল তখন বেলা পড়িয়া আসিয়াছে। কখন্

চোখের কোণ দিয়া জল গড়াইয়া পাটির উপরে পড়িয়াছে তাহা সে বুঝিতে পারে নাই। ঘুমাইলেই তাহার চোখে জল পড়ে। নীচে হইতে গানের আওয়াজ তাহার কানে আসিতেছে। চুপ করিয়া পড়িয়া সে কোন্ এক বাউলের একতারার গান শুনিতে লাগিল—

'জানি তোমার সাথে দেখা হবে
সাগর কিনারায়,
ওগো তাই ত আমি বসে আছি
নদীর মোহানায়।
বন্ধু, তুমি পথ দেখাবে—
অচিন্ পারের ভয় নাশিবে গো
আমি গান গেয়ে দাঁড় বাইবো তরী
অকূল দরিয়ায় গো—
সাগর-কিনারায়'

গান থামিল। সত্যবালা জাগিয়াছিল কিন্তু উঠিল না। এ কি তাহার ভালো লাগিতেছে? এই আরাম, এই বিলাস, এই ক্ষণিকের স্বর্গ— ইহার চেয়ে অস্বস্তিকর আর কি আছে? ওই লোকটার নেশার উপকরণ সে, কিন্তু নেশা ছাড়িবে কতক্ষণে? এই বন্দীশালা হইতে পলাইতে পারিলে সে বাঁচে, তাহার অভ্যস্ত জীবনযাত্রার ভিতরে ফিরিয়া গিয়া সে নিশ্চিন্ত হইবে, সহজ নিশ্বাস

ফেলিবে। গতরাত্রি হইতে ভালোবাসার অবিচ্ছিন্ন অভিনয় তাহার নিকট যন্ত্রণাদায়ক হইয়া উঠিয়াছে। এম্‌নি দুই চারিটি খরিদ্দার জুটিলে আর তাহার নিস্তার নাই। এতক্ষণে তাহার সঙ্গিনীরা সাজসজ্জা করিয়া প্রস্তুত হইয়াছে,—প্রতিদিন শ্রান্তিহীন তাহাদের অধ্যবসায়। দৈন্য ও দারিদ্র্যের কথা থাক্, উদরান্নের সংস্থানও যাক্, কিন্তু কত যে লাঞ্ছনা, কত অনাদর, তাহা তাহাদের জীবনের সহিত না জড়াইলে বুঝিবার উপায় নাই। আজ সত্যবালা তাহাদেরই একজন, তাহাদের ভিতরে কতক্ষণে ফিরিয়া গিয়া দাঁড়াইতে পারিবে—ইহাই মনে করিয়া সে ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

নিজের হাতে চা লইয়া প্রিয়নাথ আসিল। সূর্য্য তখন অস্তাচলে নামিয়াছে। কুঞ্জ তাড়াতাড়ি আলো জ্বালাইয়া দিয়া গেল। চা দেখিয়া সত্যবালা কহিল, অতিথিসৎকার ত হোলো, এইবার নিয়ে চলুন ?

চা রাখিয়া প্রিয়নাথ কহিল, এই যে বললে থাকতে পারো দুএকদিন ?

কেনই বা থাকা ? যেতেই যখন হবে তখন আর—

তুমি কি যাবার জন্যে বিশেষ ব্যস্ত ?

সত্যবালা কহিল, ব্যস্ত বৈ কি, বন্ধুদের দেখিনি কাল

থেকে,—হাজার হোক তাদের ওপর মায়া প'ড়ে গেছে ত !

হীরার দুল্ দুইটা তাহার কানে চক্ চক্ করিতেছিল। প্রিয়নাথ কহিল, তোমার কাছে বসলে তোমার আভা পড়ে আমার গায়ে। আমি রূপবান হয়ে উঠি। তোমাকে ছাড়তে ইচ্ছে করে না সত্যবালা।

আজ কিন্তু এখন হইতেই এ লোকটা গৌরচন্দ্রিকা করিতেছে। বুঝা যায়, হাওয়া কোন্ দিকে। কৃত্রিম সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া সত্যবালা কহিল, তাহ'লে উপায় ?

উপায় একটা আছে কিন্তু আমি শক্তিহীন, আমাকে মন্দ লোক ব'লে তুমি জেনে রেখেছ, তাই সব কথা বলতে সাহস পাইনে।

আপনি মন্দ আর আমি ভালো ? বিদ্রূপ করছেন ?

প্রিয়নাথ কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তারপর মাথা তুলিয়া কহিল, তোমার অতীত জীবন আমি জানিনে, তুমি কোন্ দুর্গম থেকে উঠে এসেছ তাও আমার জানা নেই তবু তোমার সম্বন্ধে একটা অদ্ভুত ধারণা আমার হয়েছে। তোমাকে বিদ্রূপ কেন করব সত্যবালা ? তোমার রূপে আমি ভুলিনি, রূপমুগ্ধ হবার

বয়স আর আমার নেই, কিন্তু তোমার চেহারায় যে-আভিজাত্য, সম্ভ্রান্ত ভদ্রবংশের মেয়ের যে-চিহ্ন, যে-লাবণ্য তাকে নরককুণ্ডে ছেড়ে দেওয়া—আমার ভয়ানক লোকসান মনে হচ্ছে। যদিও মদ খেয়ে গিয়েছিলুম ওপাড়ায় কিন্তু আসলে আমার প্রকৃতির মধ্যে সাবেককালের একটা নীতিবোধ আছে জেগে সত্যবালা, তোমাকে পাপের মধ্যে একটু একটু ক'রে ধ্বংস হ'তে দেখলে আমার মন কাঁটায় ক্ষত-বিক্ষত হতে থাকবে।

ওরে বাবা !—ভয়ে সত্যবালার গা ঢোল হইয়া উঠিল। এতদিন পরে সে একটা পাকা চরিত্রহীনের পাল্লায় পড়িয়াছে। মনুষ্যত্বের মুখোস পরিয়া যাহারা বেড়ায়, যাহাদের কণ্ঠে এতখানি আন্তরিকতা, তাহারা গভীর জলের নীচে বিচরণ করে। এতদিন ধরিয়া সে সুস্পষ্টরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আসিতেছে, যাহারা তাহার একান্ত শুভাকাঙ্ক্ষী ও দরদী বন্ধু তাহারাই তাহার সকলের চেয়ে বেশি ক্ষতি করিয়াছে। মানুষ ত দূরের কথা, তাহার ইষ্টদেবতার সম্বন্ধেও তাহার শ্রদ্ধা নষ্ট হইয়া গেছে।

ঈষৎ উষ্ণকণ্ঠে সে কহিল, অতগুলো মেয়ে দেখে

এলেন কিন্তু আমার ওপরেই আপনার এত নেক্‌নজর কেন?

তারা আর মানুষ নেই সত্যবালা।

সত্যবালা কহিল, আমাকেও মানুষ ব'লে ঠাওরালে আপনি ঠকবেন প্রিয়নাথ বাবু।

তবু তুমি থাকো, তোমাকে দেখি। তোমাকে বাঁচিয়ে তোলবার ভার আমার ওপর ছেড়ে দিতে পারো না?

না, বাজে কাজে আপনাকে দেবো না। বরং দেশের কাজ করুন গে, তাতে নাম আছে, বাহবা পাবেন। দয়া ক'রে পরোপকার করার চেষ্টা ভুলে যান্। আপনার এত সম্পত্তি, এত টাকা,—বরং আমাদের ওখানে মাঝে-মাঝে পায়ের ধূলো দেবেন, খুশি থাকব। আজ দুল্ পেলুম, একদিন চাই কি একটা চন্দ্রহারও পেয়ে যেতে পারি।—এই বলিয়া সত্যবালা হাসিতে লাগিল। তাকিয়ায় গা এলাইয়া সে বসিয়াছিল, ইলেক্‌ট্রিকের আলোয় তাহার সুন্দর দাঁতগুলি ঝকঝক করিতে লাগিল।

তাহলে আজকেই তুমি যাবে?—প্রিয়নাথের গলা কাঁপিয়া উঠিল।

সত্যবালা কহিল, না দুএক দিন আরো থাক্‌ব। বেশ লাগছে। নরম তাকিয়া, ঘোলের সরবৎ, শীতল পাটি, যথাসময়ে ভালোমন্দ খাওয়া, পাঁচটা চাকর দারোয়ান,—চলুন একটু হাওয়া খেয়ে আসা যাক্ মোটরে। বাস্তবিক, আপনার পাখার হাওয়াটা এত সুন্দর লাগে। কিন্তু তাই ব'লে হিসেবটা ভুল্‌ব না, যাবার সময় আমার টাকাকড়ি সব বুঝিয়ে দেবেন।

প্রিয়নাথকে মুখ মলিন করিতে দেখিয়া সে পুনরায় কহিল, গোমড়ামুখে ব'সে থাকবেন না। এই ত বেশ। দুদিনের জীবন, হেসে খেলে কাটিয়ে দেওয়া যাক্। বড়ো বড়ো কথা শুনলে আমি পড়ি বিপদে, আমরা ছোট মানুষ, আপনাদের মতন বিদ্বান নই! আচ্ছা এক কাজ করলে হয় না?

প্রিয়নাথ মাথা তুলিল।

সত্যবালা কহিল, এক বোতল মদ আনান্, খাওয়া যাক্। আমি কখনো খাইনি ওটা। আপনিত আছেন, যদি বেসামাল হই তাহ'লে ধরবেন কিন্তু, কেমন?

এ তুমি কি বল্‌চ সত্যবালা?—প্রিয়নাথ সবিস্ময়ে চাহিল।

কেন, ঠিকই ত বলচি। মদ নৈলে কি ফুর্ত্তি হয়?

তা ছাড়া বাগানবাড়ীতে এনেছেন, এমন নিরামিষ হয়ে থাকা আমারই বা ভালো লাগবে কেন বলুন ?

ভালো লাগবে না তোমার ?

একটুও না। মদ আসুক, মাংস আসুক, তবে ত ? মাংসটা অবশ্য না আসলেও ক্ষতি নেই কারণ আমিই ত সশরীরে বর্ত্তমান !—এই বলিয়া সে উচ্চকণ্ঠে একরূপ অভদ্র হাসি হাসিয়া উঠিল।

সমস্তটাই যেন তাহার একরকম বিশ্রী অভিনয়। রাগ করিয়া প্রিয়নাথ কহিল, এ বাড়ীতে ব'সে মদ আমি খাইনে।

কেন ?

চাকর ব্যকররা জানে কোনোরূপ নোংরামি আমি করিনে।

বটে ? কিন্তু চোখের সামনে একটা বেশ্যাকে যে এনে রেখেছেন এতে তারা—

তারা বুঝতেই পারেনি, তুমি কি। তোমাকে দেখে তারা মন্দ ধারণা করেনি আমি জেনেছি।

তাহ'লে সে ধারণা তাদের ভেঙে দিন্। সত্য ক'রে নিজের চেহারাটা দেখান্। বরং আপনার দু'চারজন বন্ধুকে ডেকে আনুন। জম্‌বে ভালো।

প্রিয়নাথ কহিল, তোমাকে আমি কোনোরূপ নোংরামি করতে দেবো না। মদ তোমার খাওয়া হবে না।

হবে না?—হঠাৎ সত্যবালা উত্তেজিত হইয়া উঠিল, কহিল, ভারি অভদ্র আপনি! সতীসাবিত্রী ঘরে এনে-ছেন কিনা তাই আপনার এত ধর্ম্মবুদ্ধি! যদি আমার সুনজরে থাকতে চান্ তবে শীগগির আনুন, যা বলি।

আমি আন্‌ব না।

আন্‌বেন না? অতিথিকে বাড়ীতে এনে আপমান করবেন?—বলিয়া সত্যবালা উঠিয়া বসিল।

আচ্ছা আনাচ্ছি, দাঁড়াও। বলিয়া ভয়ে প্রিয়নাথ তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল। মনে হইল, অবাধ্য হইলে হয়ত কিছু একটা অশোভন কাণ্ড ঘটিবে। সে বাহির হইয়া গেল কিন্তু মিনিট দুই পরেই আবার তাহাকে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া সত্যবালা কহিল, এখনো আনেননি? আপনার নীতিবোধে লাগছে বুঝি?

প্রিয়নাথ আম্‌তা আম্‌তা করিয়া কহিল, তুমি ওই ছাই খাবে আর আমি দাঁড়িয়ে দেখ্‌ব?

ন্যাকামি আপনার রাখুন। যান্ শীগগির।

তাহার কথায় প্রিয়নাথ অত্যন্ত আহত হইল কিন্তু

ধৈর্য্য রক্ষা করিয়া কহিল, লোকজনদের তাহ'লে আজকে ছুটি দিয়ে দিতে হবে, তা'দের সামনে আমরা যদি,— বুঝলে না, মান হানি হতে পারে।

সত্যবালা কহিল, বেশ ত, যে ক'দিন আমি থাকি, আপনার লোকেরা যেন কামাই করে ; এই ব্যবস্থা করুন গে। কি জানেন প্রিয়বাবু, আপনাকে ঠকিয়ে আমি যাব না, যথাসাধ্য আনন্দ আপনাকে আমি দিয়ে যেতে চাই।

বেচারা প্রিয়নাথের চোখে এইবার জল আসিতে বাকী রহিল। এতবড় অত্যাচার তাহার জীবনে আর কেহ করে নাই। এই মেয়েটি যেন নিজ জীবনের গ্লানি, লজ্জা ও কলঙ্কের সমস্ত প্রতিহিংসা তাহার উপর দিয়া একে একে তুলিয়া লইতেছে। ক্ষীণকণ্ঠে সে কহিল, এমনি ক'রে আমাকে আনন্দ দিতে চাও?

হ্যাঁ, এমনি ক'রেই আমরা পুরুষকে আনন্দ দিয়ে থাকি।

তুমি নিজে খুশি হবে?

আলবৎ।

প্রিয়নাথ চলিয়া গেল। পুরুষ হইয়া নারীর কাছে চোখের জল দেখাইতে তাহার ইচ্ছা হইল না।

রাত্রি শেষ হইয়া আসিয়াছে। গ্রীষ্মকালের রাত, কোথা দিয়া যে চারিটা বাজিয়া গেল তাহা দুইজনের একজনও বুঝিতে পারে নাই। প্রিয়নাথ কিছুতেই খাইবে না, খাওয়া তাহার অভ্যাস নয়, কিন্তু সত্যবালার সহস্র অনুনয় বিনয়, উপরোধ, মান অভিমান,—অবশেষে তাহাকে খাইতে হইল।

সত্যবালা নিজে কিছু পরিমাণ পান করিয়াছে, নেশাও বেশ ধরিয়াছে। প্রিয়নাথের নেশাটাও এইবার ধরিল। মাথাটা তাহার পরিষ্কার বলিতে হইবে, সহজে সে আত্ম-সংযম হারায় না।

—কোথাও আমার বাঁধাবাধি নেই, বুঝলে, ওসব আমি মানিনে। আর শাসন ? আমাকে শাসন করবে ? সমাজ, শাস্ত্র, সংস্কার ? আমি এদের ওপরে, মুক্তপুরুষ !

সত্যবালা চুপ করিয়া বসিয়াছিল। তাহার চোখ কাঁপিতেছে।

তোমাকে আমি অনেক দিতে পারি, এক কথায়! আমাকে পরীক্ষা করবে, আমি কেমন লোক,? নেশা আমার হয়নি, সত্যবালা। হ্যাঁ, আমি একটু দাম্ভিক। হবে না? এত টাকা, এত প্রতিষ্ঠা! আমার মতন এমন একটা বিচিত্র চরিত্র তুমি কি খুঁজে পাবে?

নেশা তাহার একটু হইয়াছে। সত্যবালার মুখ দেখিতে দেখিতে আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। আঃ এইবার সে বাঁচিল। যাহাকে স্পষ্ট করিয়া চিনিবার জন্য তাহার সমস্ত প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল তাহাকে এত সহজে যে জানা যাইতেছে, ইহার জন্য উগ্র পুলকে তাহার বুকের ভিতরটা দুলিয়া উঠিল; লোকটা দাম্ভিক ও আত্মাভিমানী। নিজেকে বড় করিয়া তুলিয়া ধরিবার প্রকৃতিটা বোধ করি তাহার সহজাত।

প্রিয়নাথ কহিল, তুমি তাহলে এখন যাবে না ত?

না। অনেকদিন থাক্‌ব।

কতদিন?

যদ্দিন পায়ে রাখেন।

রাখ্‌ব মাথায়, যদি থাকো। হ্যাঁ, নেশা আমার হয়নি। মাথা পরিষ্কার, কেন নেশা হবে? দাঁড়াও— বলিয়া প্রিয়নাথ নিজের মাথায় একটা ঝাঁকানি দিল,

কহিল, গোড়ার কথাটা বলি, তোমার জন্যে যদি আমি সব ত্যাগ ক'রে যাই ?

কোথায় ?

দূর দেশে, অনেক দূরে। তুমি খুশি হবে ? কোন্ মেয়ে না খুশি হয় বলো ? তোমাকে যে বাঁচাতে চাই।

সত্যবালা হাসিয়া হাত বাড়াইল, কহিল, তুলে ধরুন, ডুবে যাচ্ছি।

আচ্ছা, আর বল্‌ব না, চুপ করলুম।

দেখিতে দেখিতে জানালার বাহিরে ভোরের আকাশ স্বচ্ছ হইয়া আসিল। গাছে গাছে পাখীরা প্রভাতী কলরব সুরু করিয়াছে। সত্যবালা একবার উঠিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু আবার খাটের বাজু ধরিয়া বসিয়া পড়িল। নিজের অবস্থাটা মনে করিয়া তাহার হাসি পাইতেছিল।

প্রিয়নাথ আবার কথা সুরু করিল।—ছিলুম ভালো, তুমি জাগালে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে। যা কিছু ভালো তা'কে ভেঙে দিতে চাও তুমি—আশ্চর্য্য ! বিশ্বাস করো না কিছু কেন বলো ত? আমি কি এতই ছোট তোমার চোখে ? একটা কথা আমাকে তুমি দাও।

কথা? সামান্য মুখের কথা?—সত্যবালা ,কহিল, নিশ্চয় দেবো বলুন?

আমাকে ছেড়ে যাবে না তুমি।

এইজন্যে ভাবনা? আমারও নেশা হয়নি। সত্যি বলছি যাব না কোথাও। বেশ লাগছে, কেন যাব? কিসের অভাব? দাসী হয়ে থাক্‌ব পায়ে। আর একটু খাবেন?

দাও।

সত্যবালার চোখ, গলা, সর্ব্বশরীর অস্বাভাবিক উত্তেজনায় থর থর করিতেছিল। তবু সে গেলাসটা বাড়াইয়া দিল্। কহিল, খান্, একটু বেশি হ'লে দোষ নেই। খাবেন বৈ কি। এত টাকা, সম্পত্তি,—

এসব কিন্তু ভালো নয় সত্যবালা।

ভালো নয়? মাইরি আর কি! কে বললে ভালো নয়? নীতিবোধে লাগছে? নীতি আপনি মানেন? সব ভালো, সহজে যা করা যায় সব ভালো। এইত সকাল হয়েছে, আনান্ না আর একটা বোতল। শরীর ভাল আছে ত?

প্রিয়নাথ কহিল, নিশ্চয়,—আহা, এত রূপ তোমার! যেন প্রতিমা! যেন প্রতিমা! কলঙ্ক ছোঁবে তোমাকে?

তুমি পতিতা? কে বলেছে তুমি নীচে নেমে গিয়েছ? সোনার গায়ে কাদা লাগলে নোংরা হয়!

লোকটার চরম অধঃপতন দেখিবার জন্য সত্যবালা যেন মনে মনে অধীর হইয়া উঠিতেছিল। ইহাকে পথের ভিখারী করিতে না পারিলে তাহার আনন্দ নাই! রূপ যাইবে, প্রতিষ্ঠা ও আত্মাভিমান নষ্ট হইবে, রোগগ্রস্ত জরাজীর্ণ হইয়া ঘৃণিত জীবন যাপন করিবে!

সত্যবালা বসিয়া বসিয়া আনন্দে পা নাচাইতে লাগিল।

প্রিয়নাথ কহিতে লাগিল, আনন্দ হচ্ছে তোমার, কেমন? তা ত হবেই, আমি জব্দ হয়েছি, নেশা ধরেছে। আনন্দ হচ্ছে তোমার। কিন্তু ঠিকে ভুল হয়নি, সজাগ আছি। তোমাকে তেমনি সুন্দর লাগছে।

সত্যবালা হাসিতেছিল।

এই তুমি চাও? আমার অসংযত চেহারা তোমার ভাগে লাগে? পারব না সত্যবালা। আমি নীতি মানি, নোংরামি সইব না। থাকব দুজনে চিরকাল, ভদ্র হয়ে, শুচি হয়ে,—এসো আমার সঙ্গে, তোমাকে আর নেমে যেতে দেবো না।

হঠাৎ সত্যবালা উত্তেজিত হইয়া উঠিল। কহিল, চুপ করুন।

প্রিয়নাথ চুপ করিয়া গেল। কিন্তু পরক্ষণেই কহিল, থাকতে চাও না আমার কাছে? ভেসে যেতে চাও দুর্ভাগ্যের স্রোতে? কেন, কী চাও বলো!

কিছু চাইনে, চুপ করুন।—সত্যবালা চঞ্চল হইয়া উঠিল।

না, চুপ করব না আজ। তোমাকে বিশ্বাস করতে হবে আমি ভালোবেসেছি। ভদ্রসন্তান, মিথ্যে বল্‌ব না। আমি তোমাকে বিয়ে ক'রে নিয়ে যাবো সত্যবালা।

সত্যবালা উচ্চকণ্ঠে এবার হাসিয়া উঠিল। হাসিতে হাসিতে বালিশের গায়ে মাথা গুঁজিয়া পড়িল।

প্রিয়নাথ কহিল, হ্যাঁ, পাগল মনে করবে সবাই, কেমন? কিন্তু সকলের মাঝখানে আমি সকলের বড় উদাহরণ হয়ে দাঁড়াব একদিন। বিয়ে করব তোমাকে, বিয়ে,—মন্ত্র পড়া, সাতপাক, ছান্‌লাতলা,—তুমি হবে আমার স্ত্রী, রাণী! বিশুদ্ধ নির্ম্মল জীবন যাপন করব দুজনে। এই স্বপ্ন তিনদিন ধ'রে দেখছি সত্যবালা।

সত্যবালা আবার খিল খিল করিয়া হাসিতে লাগিল। সে হাসির ভিতরে ছিল প্রচণ্ড অবজ্ঞা, অসম্মানজনক নিদারুণ বিদ্রূপ!

প্রিয়নাথ এইবার শুধু আহত হইল না, সত্যবালার এই কুৎসিত হাসিতে সে অত্যন্ত অপমান বোধ করিল। গত তিনদিন হইতে একটানা তাচ্ছিল্য আর উপেক্ষা সহিয়া সহিয়া এইবার তাহার যেন সহ্যের সীমা অতিক্রম করিয়া গেল। নেশার ঘোরে ফস করিয়া কহিল, তুমি অত্যন্ত অভদ্র, ইতর! আমার এত বড় আদর্শকে তুমি খেলো ক'রে দিতে চাও, নোংরা জীবন যাপন করাই দেখছি তোমার পেশা—

তাহার গলার আওয়াজ পর্য্যন্ত যেন বদলাইয়া গিয়াছে।

সত্যবালার হাসি তবু থামিল না! কিন্তু রক্তের ভিতরে তাহার কেমন যেন জ্বালা ধরিতেছিল। মুখ তুলিয়া হাসিটাকে বিকৃত করিয়া কহিল, আপনি খুব ভদ্র, আপনার জীবন খুব পরিস্কার! এতই যদি ধর্ম্মবুদ্ধি, তবে পরের বউকে বিয়ে ক'রে নিয়ে পালাতে চাইচেন কোন্ লজ্জায়? এই কি ভদ্র সন্তানের কাজ?—তাহার কণ্ঠে একটা কদর্য্য ইঙ্গিত বাহির হইল।

প্রিয়নাথ মুক্তকণ্ঠে কহিল, পরের বউ? তুমি? অবাক করলে! কোন্ আঁস্তাকুড় থেকে তুলে এনেছি মনে নেই? আবার বড় বড় কথা,—বেশ্যার মুখে হিতোপদেশ! সতীপনা!

বাঘিনীর মতো এইবার সত্যবালার চোখ দুইটা দপ দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। যে-শক্তি প্রয়োগ করিয়া একদা দুর্বৃত্তদের অপমান ও লাঞ্ছনা হইতে নিজের দে কে সে রক্ষা করিতে পারে নাই, যে-শক্তির অভাবে একদিন সেই পিশাচের দল তাহার মাতৃত্ব, সতীত্ব, ধর্ম্ম, সংসারের সমস্ত ঐশ্বর্য্য পদদলিত করিতে পারিয়াছিল, সেই শক্তিই যেন আজ অকস্মাৎ তাহার সর্ব্বশরীরে উজ্জীবীত হইয়া দেখা দিল। বিছানা হইতে আলুথালু নামিয়া উন্মাদিনীর মতো সে কাঁচের গ্লাসটা তুলিয়া সজোরে প্রিয়নাথের মাথার উপর ছুড়িয়া মারিল। চীৎকার করিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া কহিল, মিথ্যোবাদি, আমি বেশ্যা? আমাকে বেশ্যা বলো তুমি?

প্রিয়নাথের কপাল কাটিয়া ফিন্‌কি দিয়া রক্ত ছুটিতে লাগিল। সত্যবালা পাগলের মতো ঘুরিতে ঘুরিতে বাহির হইয়া যাইতেছিল, কিন্তু পুনরায় এক-পা ফিরিয়া অশ্রুজড়িত বিদীর্ণ কণ্ঠে কহিল, আমাকে তুমি কী দেবে? কী দিতে পারে তোমার মতন অধার্ম্মিক! আমার স্বামী আছে, সন্তান আছে,—সংসার, সৌভাগ্য, সুখ,—জানো, আমার সব ছিল, জানো তুমি?

হাত বাড়াইয়া প্রিয়নাথ তাহাকে বাধা দিতে গেল,

কিন্তু সত্যবালা লাথি দিয়া তাহার হাত ঠেলিয়া
কহিল, সব তোমার ফিরিয়ে নাও। এই নাও তো
টাকা আর—এই নাও দুল্—বলিয়া সে দুই হাত
হীরার দুল্ টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিল।

কান কাটিয়া তাহার রক্ত পড়িতে লাগিল কিন্তু
কোনও দিকে সে ভ্রূক্ষেপ করিল না, ভগ্নকণ্ঠের ভি
একরূপ অসহ্য কান্নার শব্দ চাপিতে চাপিতে সে তীরবে
নীচে নামিয়া গেল। দ্রুত, উন্মত্ত, অধীর! প্রিয়না
রক্তাক্ত অবস্থায় উঠিয়া বাহিরে আসিয়া এদিক ওদি
তাকাইতে লাগিল, কিন্তু দেখা গেল সত্যবালা ততক্ষ
উঠান পার হইয়া বাগানে পড়িয়াছে। প্রিয়নাথ একবা
ডাকিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই বাগানে
দরজা দিয়া পথে নামিয়া সত্যবালা ছুটিতে ছুটিতে
টলিতে টলিতে চলিয়া গেল।

মিথ্যাবাদীর কপালের রক্ত লাগিয়াছিল তাহার পায়ে
সেই রক্তের চিহ্ন পদে পদে পথের ধূলা স্পর্শ করিতে
লাগিল।